বালক শ্রীকৃষ্ণ

বালক শ্রীকৃষ্ণ

'নল-দময়ন্তী', 'হাসন-হোসেন' প্রণেতা

শ্রীরেবতীমোহন সেন প্রণীত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর

পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১০

মূল্য ৷৷০ আনা

কলিকাতা

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, "স্বর্ণপ্রেসে"
শ্রীমনোরঞ্জন সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্নহের শান্তিসুধা,

গোপালচরিত্র লিখিতে লিখিতে প্রায়শঃ তোমার স্নেহের গোপাল াউজী মহারাজ আমার প্রাণে স্ফুরিত হইয়া আমাকে আকুল করিয়াছেন। তাই "বালক শ্রীকৃষ্ণ" তোমারই কোমল করকমলে অর্পণ করিলাম। গাপাল তোমার কোল জুড়িয়া বুক জুড়িয়া থাকুন, শ্রীশ্রীইষ্টদেব সমীপে এই প্রার্থনা।

স্নেহানুগত

রেবতী।

নিবেদন

আমি জানি, এই কালো ছেলেটিকে মনের মতন করিয়া সাজাইয়া পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু যাঁহাকে আভরণ পরাইতে আভরণেরই শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পায় তাঁহাকে দরিদ্র আমি কি আভরণে সাজাইব? সকল সৌন্দর্য্যের আধার, সর্ব্ব-আকর্ষণ-সার নিরুপম শ্যামবর্ণ এই ব্রজের রাখাল বালকটি কৃপা করিয়া স্বীয় রূপগুণে সকলের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিবেন, আমার ইহাই একমাত্র ভরসা। ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার।

বালক শ্রীকৃষ্ণ

জন্মের পূর্ব্বকথা

অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে এই পৃথিবীতে অনেকানেক অসুর জন্মগ্রহণ করে। প্রধান প্রধান অসুরসকল ক্ষত্রিয়কুলে রাজবংশে উৎপন্ন হয়। তাহারা দেবদ্বিজে বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল ও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। এইরূপে ক্রমে পৃথিবীতে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথিবী উহাদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত ও পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন। দেবগণকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, "দেবগণ, আপনাদিগের প্রার্থনা অবগত হইলাম, এক্ষণে আপনারা ধরাতলে যাইয়া নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করুন, আমিও সত্বরই যাইতেছি, পৃথিবীর ভার মোচন করিতেই হইবে।" এইরূপে দেবগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবিষ্ণুও স্বয়ং ধরাতলে আবির্ভূত হইলেন।

ভগবান্ মথুরামণ্ডলে যাদবকুলে অবতীর্ণ হয়েন। মথুরা-মণ্ডল যাদবদিগের রাজ্য ছিল। যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের দুই বিবাহ, তাঁহার এক পত্নী বৈশ্য-কন্যা ও অপর স্ত্রী ক্ষত্রিয়-দুহিতা

ছিলেন। বৈশ্যার গর্ভে পর্জ্জন্য ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। পর্জ্জন্য বৈশ্যাগর্ভজাত বলিয়া বৈশ্য মধ্যে গণ্য হয়েন; মথুরার অদূরবর্ত্তী নন্দীশ্বর পর্ব্বতের নিম্ন দেশে তিনি বাস করিতেন। তথায় কেশী নামক দৈত্যের উৎপীড়নে উদ্বাস্ত হইয়া পর্জ্জন্য মহাবনান্তর্গত গোকুলে যাইয়া বসতি করেন। তাঁহার ন্যায় শান্ত, দান্ত, অকপট ধার্ম্মিক অল্পই দৃষ্ট হইত। তাঁহার কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মে; নন্দ মধ্যম পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে নন্দ গোকুলে গোপরাজ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে শূর নামে আর এক পুত্র জন্মে। শূরের বসুদেব নামে এক পুত্র হয়। বসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। বসুদেব ক্ষত্রিয় ও নন্দ বৈশ্য হইলেও উভয়ে এক পিতামহের সন্তান, সুতরাং পরস্পর ভাই। উভয়ের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসাও যথেষ্ট ছিল। উভয়েই নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন।

তখন মথুরায় রাজা ছিলেন যদুবংশীয় উগ্রসেন। বসুদেব উগ্রসেনের ভ্রাতৃকন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি যখন দেবকীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন উগ্রসেনের পুত্র কংস তাঁহাদের রথের সারথ্য করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কংস অকস্মাৎ দৈববাণী শুনিলেন, "তুমি যাঁহার সারথ্য করিতেছ, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার বিনাশের কারণ হইবে।" দৈববাণী শুনিয়াই কংস তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভগিনী

দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বামহস্তে দেবকীর কেশাকর্ষণ ও দক্ষিণহস্তে কটিদেশ হইতে তরবারি উত্তোলনপূর্ব্বক রোষকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রে মন্দভাগিনি! এইমাত্র আমি দৈববাণী শুনিলাম যে, তোর গর্ভজাত সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ হইবে, অতএব এই অসির আঘাতে তোকে বিনাশ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হইতেছি।"

বলা বাহুল্য যে কংস অসুরের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মে ইনি হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা কালনেমি ছিলেন। সুতরাং এরূপ আকস্মিক দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নয়।

উপস্থিত বিপদ দেখিয়া বসুদেব কংসকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অসুর-স্বভাব কংস তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবকীর বধার্থ পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন বসুদেব কংসের হস্তধারণপূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি দেবকীর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তানকেই জন্মমাত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া কংস দেবকীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বসুদেব দেবকীর সহিত স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

এই ঘটনা হইতে বসুদেবের চরিত্র-প্রভাব যে কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যায়। কংস দৈববাণী অভ্রান্ত বলিয়াই জানিতেন ও

মানিতেন। দেবকীর পুত্র তাঁহার বিনাশকর্ত্তা হইবে, এই দৈববাণী তিনি পূর্ণমাত্রায়ই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাই তিনি আপনার মৃত্যুর মূলোৎপাটন-মানসে তন্মুহূর্ত্তেই দেবকীর বধ-সাধনে উদ্যত হইলেন। একটি নারীবধ করিবার নিষ্ঠুরতাও কংসের হৃদয়ে বিলক্ষণ ছিল। তবে তিনি উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইলেন কেন? বসুদেবের একটি কথায়। বসুদেব যখন নিজের মুখে বলিলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানই তিনি কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন, তখন আর কংসের মনে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। বসুদেব একবার যাহা বলিয়াছেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবার নয়, এ দৃঢ় বিশ্বাস কংসের ছিল। তাই বসুদেবের কথায় নির্ভর করিয়া মৃত্যুভয়ে ভীত কংস নিশ্চিন্তমনে দেবকীকে ছাড়িয়া দিলেন। বসুদেবের একটি মুখের কথায় দুর্ব্বৃত্ত কংসের পর্ব্বতপ্রমাণ রোষবহ্নি যেন মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মুহূর্ত্তে প্রশমিত হইল। মথুরামণ্ডলে বসুদেবের চরিত্রপ্রভাব এইরূপই ছিল।

কংসের মতি-পরিবর্ত্তন

এদিকে দেবর্ষি নারদ একদিন কংসভবনে উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "রাজপুত্র, আমি আপনাকে একটি বিশেষ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এই যুগে অনেকানেক অসুর পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনিও পূর্ব্বজন্মে অসুর ছিলেন। আপনার নাম ছিল কালনেমি—

হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা। এক্ষণে অসুরগণের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত দেবগণ ধরাধামে নিজ নিজ অংশে জন্মিয়াছেন। স্বয়ং বিষ্ণু দেবকীর অষ্টমগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিনাশ সাধন করিবেন।” এই কয়টি কথা বলিয়াই নারদ চলিয়া গেলেন; ক্রোধে ও দুর্ভাবনায় কংসের মস্তক আলোড়িত হইতে লাগিল।

কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই পিতা যাদবরাজ উগ্রসেনকে অপমানিত, নিগৃহীত ও সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং মথুরার সিংহাসনে স্বয়ং রাজা হইয়া বসিলেন। রাজা উগ্রসেনের পুরাতন অমাত্যবর্গ ও সুবুদ্ধি যাদবগণের লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা রহিল না। দুর্মন্ত্রণাকুশল সাধুসজ্জন-দ্রোহী নররূপী অসুরসকল কংসরাজের পাত্রমিত্র হইল। অবিলম্বে বসুদেব সস্ত্রীক কারাগারে আবদ্ধ হইলেন।

কালক্রমে দেবকী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সে সংবাদ পাওয়া মাত্র দুষ্ট কংস কারাগারে আসিয়া সেই সদ্যো-জাত শিশুটির প্রাণনাশ করিলেন। একটি নয়, দু'টি নয়, ক্রমান্বয়ে দেবকীর ছয়টি পুত্র এইরূপে কংসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। অবশেষে ভগবান্ বলরামরূপে দেবকীর সপ্তম গর্ভে আসিয়া প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণী দেবীরও গর্ভ-লক্ষণ দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে কংসের ভয়ে গোপনে গোকুলে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দেবকীর গর্ভ সপ্তম মাসে ভগবানের যোগমায়া শক্তি দ্বারা নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভে সন্নিবেশিত হয়। ইহাতে মথুরায় লোকেরা মনে করিল যে,

বুঝি কংসভয়ে দেবকীর গর্ভপাত হইল। এই ঘটনার সাত মাস পরে রোহিণী দেবী একটি সুন্দর সুবলিত-অঙ্গ পুত্ররত্ন প্রসব করেন। এইরূপে বলরামের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-তিথি শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা শ্রাবণী পূর্ণিমা।

আবির্ভাব

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে স্বপ্নযোগে বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করিয়া দেবকীর অঙ্গকান্তি দিন দিন অপূর্ব্ব লাবণ্যযুক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার দিব্য অঙ্গ প্রভায় কংস-কারাগার উজ্জ্বল বোধ হইতে লাগিল। একদিন রজনীযোগে সমস্ত দেবগণ কংসকারাগারে আসিয়া জননী দেবকী ও তাঁহার গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে নানা স্তবস্তুতি করিয়া গেলেন।

ভগবান্ যে সময়ে মথুরায় দেবকীর গর্ভে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেন, ঠিক সেই ক্ষণেই তিনি স্বীয় যোগমায়ার সহিত দ্বিভুজ মধুর মূর্ত্তিতে গোকুলে গোপরাজ নন্দের হৃদয় হইতে তৎপত্নী যশোদার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন। তাহার বিবরণ এই—অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের লীলা ও মহিমার সীমা করিতে পারে কাহার সাধ্য ? নন্দ রজনীযোগে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রভাতে উঠিয়াই তাহার বৃত্তান্ত শ্রীমতী যশোদার নিকট বলিলেন। গোপরাজ বলিলেন, “আমি দেখিলাম, একটি অপূর্ব্ব চঞ্চল-চারু-নয়ন কৃষ্ণবর্ণ বালক তোমার কোলে খেলা

করিতেছে। বাৎসল্যবশতঃ তোমার স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধধারা বিগলিত হইয়া ঐ বালকের মুখে ও কৃষ্ণ অঙ্গে পতিত হইতেছে। সেই বালকমূর্ত্তি আমার অন্তরে স্ফুরিত হইয়া অনুক্ষণ আমার সমস্ত প্রাণ মন আকর্ষণ করিতেছে। আমি কিছুতেই আত্ম-সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমতী যশোমতী বলিলেন, "গোপরাজ, আমিও গত রাত্রিতে ঐরূপই স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, কিন্তু লজ্জাবশতঃ আপনাকে বলিতে পারি নাই। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বালকের সেই মনোহর মূর্ত্তি ভুলিতে পারিতেছি না।" এই অদ্ভুত ঘটনার কিছুদিন পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উভয়ের নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া অনেকানেক কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরক্ষণেই বোধ হইল যে, সেই কৃষ্ণবর্ণ বালক গোপরাজের হৃদয় হইতে প্রথমতঃ যশোদার হৃদয়ে ও তদনন্তর তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। জাগরিত হইয়া উভয়ে উভয়ের নিকট স্ব স্ব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। উভয়ের হৃদয় আশা ও আনন্দে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র এক বৃদ্ধা তাপসী আসিয়া নন্দ-ভবনে দেখা দিলেন এবং নন্দ মহারাজকে বলিয়া গেলেন, "আমি দৈবজ্ঞা তপস্বিনী; দৈবকৃপায় জানিলাম, অচিরে আপনার একটি সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্র হইবে; ইহা বলিবার জন্যই আসিয়া-ছিলাম।" বাস্তবিক ইহার কিছুদিন পর হইতেই নন্দরাণীর গর্ভলক্ষণসকল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

জন্ম

বর্ষাকাল—ভাদ্র মাস; কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি। শুভক্ষণে শুভলগ্নে রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে কংস-কারাগারে দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ গদা পদ্ম ও চক্র। সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ মণিমুক্তাময় দিব্যালঙ্কার শোভা পাইতেছে। তাঁহার অঙ্গের স্নিগ্ধোজ্জ্বল নীলকান্তি ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও ম্লান করিতেছে। বক্ষঃ-স্থলে শ্রীবৎসলাঞ্ছন ও পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত এই অপূর্ব্ব বালক-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বসুদেব ও দেবকীর হৃদয় যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে নানা স্তবস্তুতি দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার মনোভাব অবগত হইয়া আপনার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সংবরণপূর্ব্বক দ্বিভুজ নরবালকরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বসুদেব ও দেবকী বাৎসল্যপ্রভাবে আনন্দে আত্ম-হারা হইলেন, কিন্তু দুর্বৃত্ত কংসের কথা মনে উদিত হওয়া মাত্র তাঁহাদের হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। কারণ এই বালক দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, ইহার উপরেই কংসের যত আক্রোশ। কংস জানিতে পারিলে এই ক্ষণেই আসিয়া শিশুটিকে বিনাশ করিবে। এখন উপায় কি? বসুদেব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

"পিতঃ, আপনি আমাকে গোকুলে নন্দালয়ে শ্রীমতী যশোদার ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে যে আমার মায়া কন্যারূপে জন্মিয়াছেন, সেই সদ্যোজাত কন্যাটিকে আনিয়া এস্থানে রক্ষা করুন।" ইহা বলিয়াই কৃষ্ণ সদ্যোজাত শিশুটির মতই হইলেন।

বসুদেব পুত্রটিকে বুকে করিয়া কারাগার হইতে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণের মায়াপ্রভাবে তখন মথুরায় সমস্ত জনপ্রাণী মৃতের ন্যায় অচেতন। কারাগারের দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া গেল। বসুদেব অনায়াসে রাজপথে বাহির হইয়া দ্রুতগমনে যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে; চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়াছে; ক্রোড়স্থিত কৃষ্ণবর্ণ শিশুটিকেও তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। ওপারে যাইতে হইবে। কিন্তু ভরাপূরা বর্ষায় যমুনার জল কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। দুর্যোগনিবন্ধন কালিন্দীর কাল জলপ্রবাহ সফেন-উত্তাল-তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে; মনে হইতেছে যেন সহস্র সহস্র কালনাগিনী মহা-রোষে ফণা বিস্তার করিয়া বারংবার উঠিতেছে ও পড়িতেছে। এ দুর্যোগে বসুদেব কেমন করিয়া পার হইবেন!

বসুদেবের আর ভাবিবার সময় নাই। তিনি শ্রীহরি মধুসূদন স্মরণ করিয়া যমুনার জলে পা বাড়াইলেন কিন্তু শ্রীমধু-সূদন যে তাঁহার বক্ষেই বিরাজ করিতেছেন, বসুদেব বাৎসল্য বশতঃ তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যের

বিষয়, তাঁহার গমনপথে যমুনার জল জানুপরিমিত হইল! বসুদেব অনায়াসে হাঁটিয়া পার হইলেন। আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল; তখন যদিও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছিল তথাপি বসুদেব ও তাঁহার ক্রোড়স্থিত শিশুর অঙ্গে এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়িল না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্টিধারা হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং অনন্তদেব বসুদেবের মস্তকোপরি ছত্রাকারে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।

বসুদেব অবলীলাক্রমে যাইয়া নন্দব্রজে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাতে জন্মগ্রহণ করেন ঠিক সেই সময়ে তিনি স্বীয় যোগমায়ার সহিত গোকুলে যশোদার কোলেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আবির্ভাব গোকুলে কেহই জানিতে পারে নাই। বসুদেব নন্দালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; যশোদার পার্শ্বে একটি সদ্যোজাত কন্যা রহিয়াছে। স্বীয় শিশুটিকে যশোদার অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া বসুদেব প্রস্থান করিলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া উহাকে দেবকীর শয্যায় শোয়াইয়া রাখিলেন। অমনি বসুদেবের চরণদ্বয় পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কারাগারের দ্বার আপনা হইতেই রুদ্ধ হইল।

দেবকীর ক্রোড়ে বালিকা ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেবকী কন্যাটিকে যতই শান্ত করিতে লাগিলেন, কন্যাটি ততই অধিক কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে কারারক্ষকগণ সকলেই জাগিল এবং দেবকীগৃহে নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া অমনি

ছুটিয়া গিয়া কংসমহারাজকে সে সংবাদ জানাইল। কংস ভয়ে ভয়ে দেবকীর সন্তান প্রসবের অপেক্ষা করিতেছিলেন; সন্তান জন্মিয়াছে শুনিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। "এবারে আমার কাল আসিয়াছে," এরূপ মনে করিয়া কংসের দেহ মন এলাইয়া পড়িল; দুর্ব্বল মৃতবৎ শরীরটি তুলিয়া বসিবার শক্তিও যেন তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে! কংস বহু চেষ্টায় উঠিয়া বসিলেন এবং মনে মনে এই বুদ্ধি স্থির করিলেন যে, "এই কালরূপী শিশুকে বাড়িতে দিলেই আশঙ্কার কথা। এক্ষণে গিয়া যদি উহাকে বধ করিয়া ফেলি তবেই ত আপদ চুকিয়া যায়। আমি কি মূঢ় যে, উহাহইতে ভয় পাইতেছি। একটি নবজাত শিশুকে অঙ্গুলি দ্বারা পিষিয়া মারিতেই বা আমার ন্যায় বীরের কতক্ষণ লাগে?"

কংস আর এক তিল বিলম্ব না করিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং সাহসে বুক বাঁধিয়া দ্রুতগতিতে কারাগারের দিকে চলিলেন। কিন্তু এই সাহসের মধ্যেও যেন ভূতের ভয়ের মত একটা ভয়ের অন্ধকার তাঁহার বুকের ভিতর রহিয়া গেল। তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়াই দেবকীর ক্রোড় হইতে কন্যাটীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া সবলে সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু এ কি হইল! কন্যাটী শিলা'পরে পতিত না হইয়া, ঊর্দ্ধে উঠিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তিতে আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অষ্ট ভুজ; অষ্টভুজে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়গ,

শঙ্খ, চক্র ও গদা এই সকল আয়ুধ শোভা পাইতেছে। দেবীর সর্ব্বাঙ্গ দিব্যমালা, দিব্য বসন, চন্দন ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে সুশোভিত। কংস বিমূঢ়ের ন্যায় সেই মূর্ত্তির পানে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেবী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন," রে দুষ্ট অসুর, আমাকে বধ করিতে পারিলেই বা তোর কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইত ? নিশ্চয় জানিও

"তোমাকে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।"

এই বলিয়া দেবী অষ্টভুজা অন্তর্হিতা হইলেন।

কংস অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভগিনী দেবকীর সমীপে গমন করিলেন। "দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁহার বিনাশের কারণ হইবে" এই দৈব বাণী মিথ্যা হইল ভাবিয়া কংস নিশ্চিন্তমনে বসুদেব ও দেবকীকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং অনর্থক তাঁহাদিগের ছয়টি সন্তান বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপের সহিত তাঁহাদের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসুদেব কারামুক্ত হইয়া দেবকীর সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

কংসের দুর্ব্বুদ্ধি

সে রাত্রিতে কংসের নিদ্রা হইল না। তিনি প্রভাত হইবামাত্র মন্ত্রিগণকে ডাকাইয়া আমূল সকল বৃত্তান্ত তাহাদের নিকট বলিলেন। দুষ্ট মন্ত্রিগণ সকলেই একবাক্যে বলিল,

"মহারাজ! সেই দুষ্ট বিষ্ণু নিশ্চয়ই কোনও স্থানে জন্মিয়াছে; তাহাকে বধ করিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। অতএব কি মথুরায় কি অন্যত্র সমস্ত মথুরামণ্ডলে দশ বৎসরের অনতি-বয়স্ক বালকদিগকে হত্যা করাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান কার্য্য। দেবতারা আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু; বিষ্ণু যেখানে ধর্ম্ম সেখানে, অথবা ধর্ম্ম যেখানে বিষ্ণু সেখানে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। ধর্ম্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং দক্ষিণা সমেত যজ্ঞ। অতএব বেদবাদী, তপস্বী, যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ ও গাভীসকল বধ করা যাউক, তাহাই বিষ্ণুবধের প্রকৃষ্ট উপায়।"

এ সকল উপদেশ বাক্য কংসের নিকট বড়ই যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। অসুর-সংসর্গে কংসের অসুর-বৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিল। সমস্ত মথুরামণ্ডলে গো-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ও অবাধ শিশুবধের স্রোত চলিতে লাগিল।

নন্দনন্দন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নন্দরাণী কন্যা প্রসব করিয়াই কৃষ্ণের মায়ায় নিদ্রিতা হইয়া পড়েন। পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। শেষ রাত্রে বালকের ক্রন্দনধ্বনিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সূতিকাগৃহের ধাত্রীগণও সকলেই জাগিলেন। যশোদা বালকের অপূর্ব্ব শ্রী দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, বাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ

ও দেহ-মন পুলকিত হইল, তিনি শিশুটিকে কোলে করিয়া তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আর চক্ষে পলক নাই! মরি, মরি, কি রূপ! নবজলধরের ন্যায় ইহার অঙ্গের আভা। না না, বুঝি ইন্দ্রনীলমণির নীলজ্যোতি বালকের অঙ্গে বিভাসিত; না, না, তাহা ত নহে, বিধাতা বুঝিবা নীলোৎ-পলদলের স্নিগ্ধ কোমল শ্যামল রাগে ইঁহার অঙ্গরাগ করিয়াছেন। শিশুর চারুনয়নদ্বয় দু'টি কমলদলের ন্যায় আকর্ণবিস্তৃত; মনোহর অধর বিম্বফল জিনিয়া শোভা পাইতেছে; করতল দেখিয়া রক্তোৎপল বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে; দু'টি স্থলকমল যেন পদতলে পড়িয়া লুটাইতেছে! বালকের রূপের তুলনা হয় না, ঐরূপের তুলনার স্থল একমাত্র ঐ রূপ। উহার—

"প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥"

ধাত্রীগণ শিশুর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে উল্লাসে মাতিয়া আনন্দকোলাহল করিতে লাগিলেন। তাহাতে নন্দমহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ত্রস্তব্যস্তে সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিয়া চাহিয়া দেখেন যে, নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও নীলকমলদলের ন্যায় কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট সুকুমার কুমার যশোদার কোল উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে। নন্দের প্রাণে আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া নন্দমহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

রোহিণীদেবীও সূতিকাগৃহে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত

বালকের আপাদমস্তক অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; যতই দেখেন ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়, বুঝি বা কোটীনেত্রে দর্শন করিলেও দর্শনের সাধ মিটে না।

নন্দোৎসব

প্রভাত হইল। গোকুলের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে নন্দভবনে আসিতে লাগিলেন। নন্দমহারাজকে ব্রজমণ্ডলে সকলেই মান্য করেন, ভক্তি করেন ও প্রাণ হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করেন। তাই এই আনন্দের সমাচার পাইয়া সকলেই কুমার দেখিতে আসিলেন। ব্রজকামিনীগণ আনন্দে দিশাহারা হইয়া আপনাপন সন্তান ফেলিয়া যশোদানন্দনকে দেখিবার জন্য বিগলিতকেশে বিচলিতবেশে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। বালক বালিকাগণ, কেহবা ছোট ভগ্নীটিকে কেহ বা শিশু ভাই-টিকে কোলে লইয়া, চলিতে পারিতেছে না তথাপি কি যেন এক উৎসাহে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া নন্দের মন্দিরে উপস্থিত হইল। নন্দমহলে আনন্দের হুলাহুলি পড়িয়া গেল।

বালকের রূপের মধ্যে এমনই একটা মোহিনীশক্তি, এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে যে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রজের নর-নারী সকলেই মুগ্ধনেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। বালকের যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে সেই অঙ্গেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়। সেই কৃষ্ণবর্ণ শিশুটি স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা এমনই আনন্দবিস্তার করিলেন যে, উপস্থিত গোপ-গোপীবৃন্দ উল্লাসভরে নৃত্য

লাগিলেন। তাঁহারা ভাঁড়ে ভাঁড়ে দধি, দুগ্ধ, ঘোল ও হরিদ্রারস আনিয়া অঙ্গনে ঢালিয়া এবং একে অন্যের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সস্ত্রীক দেবগণও নরনারীর বেশে ব্রজে আসিয়া কৃষ্ণদর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ভক্তকবি গাহিয়াছেন—

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লাঠি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ গাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥"

নন্দ মহারাজের আনন্দের ইয়ত্তা কে করিবে? তিনি আজ মনের আনন্দে তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। নন্দ বারংবার ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন এবং আপনার সম্মুখে যাহা পাইতেছেন তাহাই লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাট, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে দুই হাতে বিলাইয়া দিতেছেন। সমস্ত দিয়াও তৃপ্তি নাই। আর কি আছে, আর কি দিবেন, এই ভাবেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বার বার ঘর-বাহির করিতেছেন!

ভাগ্যবতী যমুনার কূলে ভাগ্যবতী যশোদার কোলে কৃষ্ণচন্দ্র উদিত হইয়া আজি জগতের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল ও নিরানন্দ-অন্ধকার দূর করিলেন। বসুমতীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল, স্থাবর-জঙ্গম সুমঙ্গলময় আনন্দমূর্ত্তি ধারণ করিল।

নন্দের মথুরাগমন

ইতিমধ্যে কংসমহারাজের প্রাপ্য বার্ষিক কর দিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। নন্দ অন্যান্য গোপদিগের উপর গোকুল-রক্ষার ভার দিয়া গোশকটারোহণে মথুরায় গমন করিলেন। মথুরায় পৌঁছিয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে কংসভবনে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রাপ্য কর প্রদান করিলেন এবং তৎপর বিশ্রাম-বাটীতে ফিরিয়া স্নানাহার সমাপন করিলেন। নন্দের আগমন-সংবাদ শুনিয়া বসুদেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। বহুদিনের পর উভয়ে উভয়কে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন।

বসুদেব নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক ছিলে, এক্ষণে যে একটি পুত্র লাভ করিয়াছ ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি; বড়ই সৌভাগ্যের কথা। বালকটি ও তাহার প্রসূতি ভাল আছেন ত? এক্ষণে তুমি যে গোকুলে বাস করিতেছ তাহার মঙ্গল ত? তথায় ত কোনও রোগের প্রাদুর্ভাব নাই? সেখানে গবাদি পশুসকলের কুশল ত? আর জল, তৃণলতা ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়? ভ্রাতঃ! আমার পুত্র তাহার প্রসূতির সহিত তোমার আলয়ে রহিয়াছে,

তাহারা ভাল আছে ত ? তাহাদিগকে তোমাদের কাছে রাখিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি, জানিবে।”

নন্দ বসুদেবের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ ! ক্রমে তোমার ছয়টি পুত্র কংসকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। অবশেষে একটি কন্যা জন্মিল, সেটিও স্বর্গে গমন করিল। সকলই অদৃষ্টাধীন।” বসুদেব বলিলেন, “সত্যই বলিয়াছ, অদৃষ্টই সর্ব্বত্র বলবান্। যাহা হউক, তোমার রাজস্ব দেওয়া হইয়াছে, আমার সহিতও সাক্ষাৎ হইল ; এখন আর তোমার এখানে বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না। আমি তোমার অনুপস্থিতিবশতঃ গোকুলে নানা উৎপাতের আশঙ্কা করিতেছি। অতএব তুমি শীঘ্র ব্রজে গমন কর।”

অতঃপর নন্দ বসুদেবের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মথুরা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “বসুদেব মহা তাপস, ঋষিতুল্য লোক ; তিনি কি একটা কিছু না বুঝিয়াই গোকুলে উৎপাত-সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন ? শুনিলাম, বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে। কি জানি সেই রাক্ষসী গোকুলে গিয়া কোনও অনর্থ ঘটাইল না কি তাহাই বা কে জানে ? নারায়ণ রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার যেমন ইচ্ছা তাহাই হইবে।” নন্দ পথে পথে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

পূতনাবধ

এদিকে পূতনা সত্য সত্যই ঐ দিবস গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসীরা নানা মায়া জানে এবং ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিতে পারে। পূতনা একটি পরম সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধরিয়া নন্দভবনের দিকে যাইতে লাগিল। এমন নিখুঁত সুন্দরী বুঝি বা নরলোকে হয় না। তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য, মনোহর বেশভূষা, হাস-বিলাসযুক্ত মধুর কটাক্ষ ও ধীরললিত গমনভঙ্গী দেখিয়া গোপগণ মুগ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাহা হইতে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা কাহারও প্রাণে উদিত হয় নাই। সে নিঃশঙ্কচিত্তে নন্দালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক, যে গৃহে শ্রীকৃষ্ণ শায়িত ছিলেন তথায় গমন করিল। যশোদা ও রোহিণী সেই ঘরেই বসিয়া দুইজনে কৃষ্ণবিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। পূতনা যে দুষ্ট অভিপ্রায়ে আসিতেছে নন্দনন্দন তাহা জানিতে পারিলেন। কেনই বা জানিতে পারিবেন না। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্, কেবল লীলা করিবার জন্যই যশোদার ঘরে নিতান্ত নিঃসহায় শিশুটি হইয়া শুইয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ মায়াবিনী পূতনাকে স্বীয় মায়াদ্বারা মুগ্ধ করিবার জন্য যেন নিদ্রিত আছেন এইভাবে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

পূতনা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৃষ্ণের নিকটে গিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইল। যশোদা ও রোহিণী উহা দেখিয়া কোনই আশঙ্কা করিলেন না, বরং সুন্দরী পূতনা

অপরিচিতা হইলেও তাঁহাদিগের তনয়কে যে সে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লইল ইহা দেখিয়া উভয়ে আনন্দিতই হইলেন এবং মুগ্ধার ন্যায় সেই রূপবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ ত মনে মনে হাসিতেছেন। কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়াই রাক্ষসী পূতনা অমনি তীব্রহলাহলবিলেপিত স্তন তাঁহার মুখে দিল। কৃষ্ণ স্তন্য পান করিবার ছলে রাক্ষসীর সমস্ত জীবনী-শক্তি শোষণ করিতে লাগিলেন। পূতনা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, ছাড় ছাড়, প্রাণ গেল!" এইরূপ বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু ঐ কাল ছেলেটি যে ছাড়িবার পাত্র নয়। পূতনা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্বীয় রাক্ষসীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গোষ্ঠমধ্যে পতিত হইল, তাহাতে ব্রজমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। গোপ-গোপীগণ ছুটিয়া আসিয়া দেখেন যে, বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসী পর্ব্বত-প্রমাণ দেহ বিস্তার করিয়া মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং ক্ষুদ্র শিশু যেমন নির্ভয়ে মায়ের কোলে থাকিয়া মহাসুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ সঞ্চালনপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, কৃষ্ণও তদ্রূপ উহার বক্ষঃস্থলে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন!

যশোদা ব্যস্ততাসহকারে পুত্রকে কোলে লইয়া বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রোহিণীদেবী আসিয়া যশোদার কোল হইতে কৃষ্ণকে নিজের কোলে লইতে হাত বাড়াইলেন, কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়া তাঁহার কোলে গেলেন। অতঃপর তাঁহারা শিশুকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলেই

বুঝিলেন যে ইহা অপদেবতার কাজ। এজন্য গোপিকাগণ মিলিয়া প্রচলিত নিয়মানুসারে বালকের রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার আপাদমস্তক গোপুচ্ছদ্বারা ঝাড়িলেন, তৎপর গোমূত্র, গোময় ও দুগ্ধ দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিলেন, পরে দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ দেবতার নাম লিখিয়া রক্ষাবিধান করিলেন। এইরূপে গোপীগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণের রক্ষাবিধানকার্য্য সম্পন্ন হইলে মাতা স্বীয় তনয়কে স্তন পান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন।

ইতিমধ্যে নন্দ মথুরাহইতে প্রত্যাগত হইয়া পূতনার বিশাল মৃতদেহদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বসুদেবের বাক্য সত্য হইল দেখিয়া তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোপগণ পূতনার দেহ কুঠারদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে লইয়া গিয়া কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। দাহ করিবার কালে ঐ দেহ হইতে মহা সদ্‌গন্ধযুক্ত ধূম উত্থিত হইতে লাগিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করায় উহার দেহ সদ্যঃ পবিত্র হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পূতনা গোলকধামবাসিনী হইয়া তাঁহার ধাত্রীগণ মধ্যে গণ্য হইলেন।*

---

* ব্যাসদেব ভক্তমুখে বলিয়াছেন ঃ—

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

আহা! যে রাক্ষসী পূতনা হিংসাপূর্ব্বক আপনার স্তনে তীব্র হলাহল বিলেপিত করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইয়াছিল, কৃষ্ণের কৃপায় সেও ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হইল! এমন দয়াল ঠাকুরের শরণাপন্ন না হইয়া আর কাহার শরণ লইব?

শকটভঞ্জন

যশোদানন্দন দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া তি . মাস বয়সে উপনীত হইলেন। কৃষ্ণ একেইত রূপের সাগর, তাহাতে আবার যত দিন যাইতেছে ততই তাঁহার শ্রী, সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রজাঙ্গনাগণ দিনে দশ বার আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছেন, স্নেহভরে স্পর্শ করিতেছেন, কোলে করিতেছেন। তাঁহারা বালককে মাথায় রাখিবেন কি বুকে রাখিবেন, কি নয়নের মণি করিয়া রাখিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। যশোদার বালকটির এমনই আকর্ষণ!

কৃষ্ণের তিন মাস বয়সে পদার্পণ করা উপলক্ষে নন্দমহারাজ তাঁহার কল্যাণে মহাসমারোহে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদির আয়োজন করিলেন। দেখিতে দেখিতে উৎসবের দিন সমাগত হইল, নন্দের মন্দিরে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, বিবিধ বাদ্য-গীত-কোলাহলে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। ব্রজের গোপীগণ বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া দলে দলে নন্দগৃহে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে আসিলে মা যশোদা তাঁহাদিগকে লইয়া উৎসবের যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর পুত্রের স্বস্ত্যয়ন ও স্নানাদি কার্য্য সমাধা হইলে পুত্রকে নিদ্রাকাতর দেখিয়া তিনি তাঁহাকে একটি শকটের নিম্নভাগে লম্বিত দোলায় ধীরে ধীরে শয়ন করাইলেন এবং তথা হইতে আসিয়া উৎসবের আর আর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

প্রথমে ব্রাহ্মণভোজন, তৎপর নিমন্ত্রিত গোপগণের আহারাদি সম্পন্ন হইল। অবশেষে ব্রজসুন্দরীগণ আহারে বসিলেন। স্বয়ং নন্দরাণী ও রোহিণীদেবী তাঁহাদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। রমণীগণ আহার করিতে করিতে পরস্পর বিবিধ কৌতুকসম্ভাষণে ও হাস্যপরিহাসে নন্দগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

সকলেই উৎসবে উন্মত্ত। এই সুযোগে কংস-প্রেরিত এক অসুর কৃষ্ণের সংহারের নিমিত্ত অদৃশ্যকায় হইয়া নন্দালয়ে প্রবেশ করিল এবং যে শকটের নিম্নভাগে নন্দনন্দন শায়িত ছিলেন তদুপরি সূক্ষ্মদেহে লুক্কায়িত থাকিয়া স্বীয় ভারে শকটখানা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া বালককে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন কিন্তু এই উৎসব-কোলাহলের মধ্যে তাঁহার ক্রন্দন-ধ্বনি কেহই শুনিল না। তিনি রোদন করিতে করিতে হঠাৎ একবার চরণদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত করিলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কোমল চরণের আঘাতেই শকটখানা উলটিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং নিকটে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ও নবনীতে পূর্ণ যে সকল পাত্র ছিল তৎসমুদয়ও ভগ্ন হইয়া গেল। শকট ভগ্ন হওয়াতে শকটাশ্রিত সেই সূক্ষ্মশরীরধারী অসুরও সেই সঙ্গেই নিধনপ্রাপ্ত হইল।

ইতিমধ্যে যশোদা বালকের নিকটে আসিয়া দেখেন যে, বালক রোদন করিতেছে, আর শকটখানা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইয়া

তাঁহার মুখে স্তন দিলেন, কৃষ্ণ শান্ত হইলেন। শকটভঞ্জনের কথা শুনিয়া অমনি বাড়ীশুদ্ধ লোক আসিয়া সেই স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। বালকেরা বলিল, "আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শিশুর পদাঘাতেই শকটখানা উলটিয়া পড়িয়াছে।" কিন্তু তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে কে? এই ক্ষুদ্র বালকের পদাঘাতে একটা শকট উলটিয়া পড়িল, এমন অসম্ভব কথা পাগল ভিন্ন কে বিশ্বাস করিবে? কারণ সকলেই কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ। কৃষ্ণ আপনাকে প্রকাশ করিয়াও প্রকাশ করিতেছেন না, ধরা দিয়াও ধরা দিতেছেন না।

নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ও যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণ, এই ঘটনা নিশ্চয়ই কোনও গ্রহবৈগুণ্যে ঘটিয়াছে, এমত বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পূজা, অর্চ্চনা ও দান প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতিকার করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভূরি দানগ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া সামান্যবালক-বোধে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা শ্রীকৃষ্ণের স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

নামকরণ

শ্রীনন্দনন্দনের বয়স যখন ছয়মাস তখন যদুদিগের পুরোহিত মহাতপা গর্গ, বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, নন্দালয়ে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া নন্দের পরম আনন্দ জন্মিল। নন্দ মুনিবরকে ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক বসিবার আসন দিয়া

করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "ব্রহ্মন্, আপনার শুভাগমনে আজি আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার আলয় পবিত্র হইল। প্রভো, আমাদের বালক দুইটি এক্ষণে নামকরণের বয়সে উপনীত। আপনি যখন কৃপা করিয়া অধমের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন তখন আমার প্রাণের একান্ত অভিলাষ যে, আপনার দ্বারাই বালকদ্বয়ের নামকরণকার্য্য সম্পন্ন হয়। গৃহে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা।"

গর্গের ইচ্ছা যে গোপনে সংস্কার করেন। এজন্য তিনি বলিলেন, "গোপরাজ, আমি যদুদিগের আচার্য্য বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার করি তবে লোকে এই পুত্রকে দেবকীপুত্র জ্ঞান করিবে। তোমার সহিত যে বসুদেবের বিশেষ সখ্য আছে, তাহা দুরাত্মা কংসের অবিদিত নহে। আর দেবকীর কন্যা দেবীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া কংসকে যে কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হয়েন, কংস তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকে এবং সেই জন্যই সম্প্রতি গোকুলে কংস-চরেরা বালক হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমার দ্বারা তোমার পুত্রের নামকরণ হইলে সেই সূত্র ধরিয়া কংস নিশ্চয় মনে করিবে যে দেবকীনন্দন তোমারই গৃহে অবস্থান করিতেছেন, ইহা বিশেষ চিন্তার কথা।" নন্দ কহিলেন, "এই ব্রজপুর অতিগুপ্ত স্থান, আপাততঃ এখানে কংসের কোনও লোক নাই, আমার লোকেরাও আপনাকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই গোশালার নির্জ্জন প্রদেশে আপনি

কেবল স্বস্তিবাচনটি করিয়া দুইটি বালকের দ্বিজাতিসংস্কার করিয়া দিন।”

মুনিবর তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সম্মতি পাইয়া গোপরাজ নামকরণের উপযোগী দ্রব্যাদিসহ পুত্রদ্বয়কে লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে যশোদা ও রোহিণী আপন আপন পুত্র ক্রোড়ে লইয়া গোশালায় উপস্থিত হইলেন। গর্গ যশোদার অঙ্কস্থিত কৃষ্ণবর্ণ শিশুটিকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “অহো! আমি কি দেখিতেছি! এই বালকের সর্ব্বাঙ্গ ভগবল্লক্ষণে লক্ষিত। শাস্ত্রসমূহ যে পরমপুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি অনন্ত, দেশকালে যাঁহার পরিচ্ছেদ নাই, সেই পুরুষোত্তমই শিশুরূপে নন্দজায়ার ক্রোড়ে অবস্থান করতঃ আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় ও দেহমন আনন্দিত করিতেছেন। ইঁহাকে দর্শন করিয়া আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত ও বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে। ইঁহার দর্শনে পদে পদে আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিতেছে! এখন কি করি? আমি যদি এখন ইঁহার চরণযুগল ধারণ করি তবে নিশ্চয়ই নন্দ আমাকে উন্মত্ত মনে করিবে, ইঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেও চাপল্য প্রকাশ করা হয়। যাহাহউক, অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল, আমার বিদ্যা, কুল, তপস্যা, সকলই সফল হইল।”

অনন্তর মুনিবর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বালকদ্বয়ের নামকরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানসকল

সমাধা করিয়া নন্দমহারাজকে বলিলেন, "গোপরাজ, রোহিণীর এই পুত্রটি অতিশয় বলশালী হইবেন, এজন্য ইঁহার একনাম বল এবং নিজ গুণে সুহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া ইঁহার অন্য নাম রাম রাখিলাম। আর কোনও কারণবশতঃ কালে যদুগণের মধ্যে অনৈক্য অপ্রীতি দর্শন করিলে ইনি তাঁহাদিগকে শিক্ষাদ্বারা সম্যক্ কর্ষণ করিবেন অর্থাৎ হল-কর্ষণে যেমন বন্ধুর ভূমির সমতা সাধিত হয় তদ্রূপ ইনি সকলের মনের একতা সাধন করিয়া দিবেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম রাখা হইল সঙ্কর্ষণ *। অপর তোমার এই পুত্রটি প্রতি-যুগেই শরীর ধারণ করেন। যুগে যুগে ইঁহার শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন অতএব ইঁহার "শ্রীকৃষ্ণ" এই নাম হইল। আর তোমার এই পুত্র এক সময় বসুদেবের তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এজন্য ইঁহাকে সকলে বাসুদেবও বলিবে §। এই বালককে সামান্য জ্ঞান করিও না, পরন্তু ইঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য জানিয়া বিশেষ যত্নে ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিও।"

* প্রকৃত প্রস্তাবে দেবকীর সপ্তম গর্ভ যোগমায়া কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নন্দালয়স্থিতা রোহিণীদেবীর গর্ভে স্থাপিত হওয়াতেই রোহিণীনন্দনের নাম সঙ্কর্ষণ হয়। এই রহস্য নন্দের নিকট গোপন রাখাই গর্গমুনির উদ্দেশ্য ছিল।

§ ইহাতে নন্দ মনে করিলেন যে তাঁহার পুত্র বোধ হয় জন্মান্তরে বসুদেবের তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন।

এই বলিয়া গর্গমুনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নন্দ মুনিবরের বাক্যে আনন্দিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। নামকরণের কয়েক দিবস পরে অন্নপ্রাশন কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া গেল

কৃষ্ণ-বলরাম

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বালকদ্বয়ের শক্তি ও সৌন্দর্য্য দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। রামকৃষ্ণ দুই ভাই এখন জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ে ভর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে কটিবদ্ধ কাঞ্চির শিঞ্জনে চকিত হইয়া সহসা থামিয়া পশ্চাৎদিকে চাহিয়া থাকেন, কাহারও চক্ষে চক্ষু পড়িবামাত্র খল খল করিয়া হাসিয়া আবার দ্রুত চলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের সেই মনোহর হাস্য যাহাতে পরস্পর নির্ভিন্ন ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে কয়েকটি অমল ধবল দশনের জ্যোতি বিকশিত হইতেছে, তাঁহাদের সেই আকর্ণপ্রসারিত কজ্জলশোভিত চারু নয়নদ্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাঁহাদের সেই নিরুপম লাবণ্যময় গোপালমূর্ত্তি ও মধুর চঞ্চল গমনভঙ্গী, এ সমস্ত একত্র মিশিয়া নন্দের অঙ্গনে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরসের বিস্তার করিতেছে এবং তৎপ্রভাবে জনকজননী ও গোপগোপীগণের প্রাণ আনন্দে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। তাঁহারা স্নেহভরে 'গোপাল গোপাল' বলিয়া করতালি দিতেছেন, আর দুই ভাই আনন্দে আটখানা হইয়া দ্রুত হস্তপদসঞ্চালনে
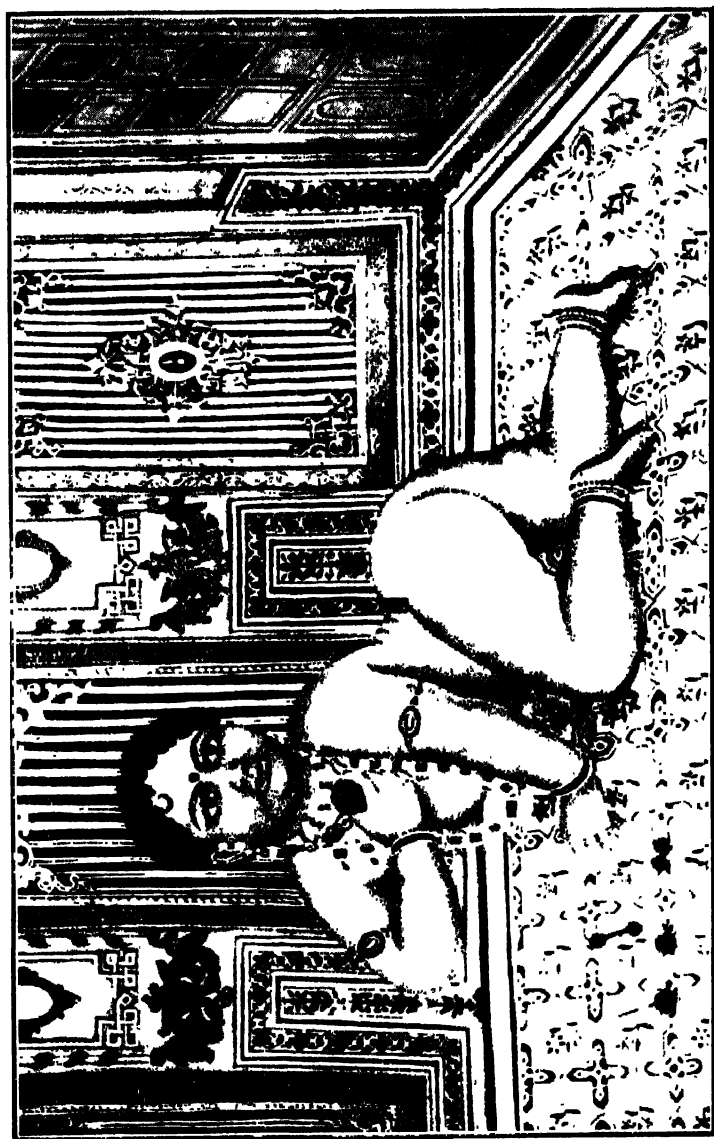
ছুটিতেছেন। রামকৃষ্ণ কখন বা স্ব স্ব পদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ-পূর্ব্বক চরণভূষণ ও কটিভূষণ কিঙ্কিণীর মধুর নিক্কণে উল্লসিত হইয়া ধাবিত হয়েন, আবার কখনও বা অপরিচিত লোকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি পদ গিয়া, তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া যেন অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া জননীদের নিকট ফিরিয়া আসেন।

এইরূপে রামকৃষ্ণ দুই ভাই নন্দের অঙ্গনে বিহার করিতে লাগিলেন এবং গোপগোপীগণের অন্তরে দিবানিশি স্ফুরিত হইয়া সকলকে তদ্গতচিত্ত করিয়া তুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা জানুঘর্ষণ না করিয়াই কিছু কিছু চলিতে আরম্ভ করিলেন।

যশোদাদুলাল

মা যশোদার কোলজোড়া ধন কৃষ্ণধন এখন এক বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার চাঁদমুখের পানে চাহিয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে স্তন পান করাইয়া নন্দরাণী আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গোপাল যখন গুটি গুটি পা ফেলিয়া ক্ষুদ্র কোমল হস্ত দুখানি প্রসারিয়া জননীর বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, জননী তখন তাঁহাকে কোলে বসাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন, বাৎসল্যে স্তনদ্বয় হইতে আপনি দুগ্ধধারা ক্ষরিত হয়; গোপাল মনের সুখে বিভোর হইয়া সেই অমৃতধারা পান করেন এবং আনন্দে ডগমগ হইয়া, হাত পা নাচাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, ও মধুর হাসি হাসিয়া জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তখন যে উভয়ের কি শোভা হয় তাহা সুরমুনিগণেরও দর্শনীয়।

ঐ দেখ, বাৎসল্যময়ীর বাৎসল্যরসে ঢল ঢল মুখমণ্ডল ক্রোড়-স্থিত নীলরতনে প্রতিফলিত ! আর সেই নীলমণির উজ্জ্বল নীল লাবণ্যরাশি মৃগশাবকনয়না জননীর নয়নে প্রতিবিম্বিত ! মরি মরি ! নন্দরাণী যখন গোপাল কোলে লইয়া বসেন তখন মনে হয়, যেন শুদ্ধ বাৎসল্য-রস-সরোবরে মনোহর কৃষ্ণকমলটি হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

এই সময়ে একদিন নন্দরাণী গোপালকে কোলে লইয়া লালন করিতেছিলেন, সহসা শিশুর ভার এত গুরু বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি সেই ভারবহনে অসমর্থ হইয়া পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া ভূমিতলে স্থাপন করিলেন। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া যশোদা কোনও মন্দ গ্রহের আশঙ্কা করিয়া শ্রীনারায়ণের ধ্যানপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে রত হইলেন।

ইত্যবসরে কংস-প্রেরিত তৃণাবর্ত্তনামক দৈত্য ঘূর্ণিবায়ুরূপে ব্রজমধ্যে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। তখন প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, ধূলিরাশিদ্বারা সমস্ত গোকুল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, নিকটস্থ বস্তুসকলও দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না। মাতা কৃষ্ণকে যেখানে রাখিয়া আসিয়া-ছিলেন সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, কৃষ্ণ তথায় নাই। তখন 'কোথায় কৃষ্ণ' বলিয়া যশোদা পাগলিনীর ন্যায় ঘরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। আহা ! আর কি মায়ের প্রাণ স্থির

থাকিতে পারে ? তিনি কেবল 'গোপাল গোপাল' বলিয়া রোদন করিতেছেন আর ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন। তাঁহার কেশ-পাশ আলুলায়িত ও বসনাঞ্চল অসংযত হইয়া পড়িয়াছে, কৃষ্ণধন হারাইয়া তিনি জগৎ শূন্য দেখিতেছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই প্রবল ঝটিকা ও ধূলিবর্ষণ থামিয়া গেল। যশোদার রোদন-ধ্বনি শুনিয়া নন্দ, রোহিণীদেবী ও অন্যান্য গোপগোপীগণ ত্রস্ত হইয়া তথায় আসিলেন এবং তাঁহাদের নয়নমণি কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে তৃণাবর্ত্ত যখন কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে-ছিল তখন কৃষ্ণ নিতান্ত শিশু হইলেও পর্ব্বতপ্রমাণ ভারী হইয়া দুই হস্তে উহার গলদেশ ধারণ করিয়া রহিলেন। অসুরাধম তৃণাবর্ত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অধিকক্ষণ এই অদ্ভুত বালকের ভারবহনে সমর্থ হইল না। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া বালককে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। কিন্তু কৃষ্ণ উহাকে এমনই শক্ত করিয়া ধরিয়া আছেন যে, তাঁহার হাত ছাড়াইতে দানবের শক্তিতে কুলাইয়া উঠিল না। দেখিতে দেখিতে তৃণাবর্ত্ত শক্তিহীন হইয়া ব্রজমধ্যে নিপতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণের সুকোমল অঙ্গে কোনই আঘাত লাগিল না।

তখন অনুসন্ধানপরায়ণা চঞ্চলনয়না ব্রজাঙ্গনাগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কৃষ্ণ মৃতদানবের বক্ষঃস্থলে নিশ্চিন্তে

বসিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া অবিলম্বে যশোদার কোলে দিলেন। হারাধন কৃষ্ণধন পাইয়া নন্দ-যশোদা যেন মৃত দেহে প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন, অন্যান্য গোপগোপীগণেরও আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বড় ভাগ্য যে ভগবান্ এই শিশুকে এ যাত্রায়ও রক্ষা করিলেন। তিনি রক্ষা না করিলে কি এইরূপ ভয়ঙ্কর দানবের হস্তে পড়িয়াও কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ।"

আর একদিন গোপালকে কোলে লইয়া যশোদা স্তন পান করাইতেছিলেন এবং স্নেহভরে "তোমার চক্ষু কই, নাক কই, দাঁত কই" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতেছিলেন ; গোপাল অঙ্গুলি দ্বারা সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। এমন সময়ে আলস্যবশতঃ কৃষ্ণ একবার জৃম্ভন করাতে তাঁহার মুখমধ্যে যশোদা আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্তই দেখিতে পাইলেন। ঐরূপ দেখিয়া যশোদার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তিনি কিছুকাল চক্ষু মুদিয়া স্তব্ধের ন্যায় রহিলেন এবং পরে উহা দৈব উৎপাত জ্ঞানে গোপালের মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে থুথু দিয়া রক্ষাবিধান করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

"কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সায়রে ডুবে পাসরে সব দুখ॥

মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভব সংসার সব তাহাতে দেখিল॥
ই কি ই কি বলি রাণী হিয়ায় ধরিল।
স্বপন দেখিনু কিবা বুঝিতে নারিল॥
থুতু থুতু দেয় রাণী বসনের দশি।
দেখিয়া মায়ের রীত ওনামুখে হাসি॥"

(ঘনশ্যাম দাস)

শ্রীকৃষ্ণের বালচাপল্য

কৃষ্ণবলরাম এখন হাঁটিতে চলিতে সুদক্ষ হইয়াছেন এবং সকল কথাই বলিতে শিখিয়াছেন। সময় সময় কৃষ্ণের বাক্-পটুতা দেখিয়া সকলকে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। দুই ভাই এখন আর একদণ্ডও স্থির হইয়া থাকেন না। তাঁহারা কখন বা বৎসগণের পুচ্ছ ধরিয়া নাচিতে থাকেন, আর বৎসগণ অমনি তাঁহাদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, রামকৃষ্ণ আর চলিতে না পারিয়া পুচ্ছ ছাড়িয়া দেন এবং মাটিতে পড়িয়া গিয়া গড়াগড়ি দিয়া উঠেন। তাহা দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাসকল কৌতুকভরে হাস্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা দুই ভাই গাভীগণের বাঁটে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করেন, গাভীগণ আনন্দে অভিভূত হইয়া দু'টি চক্ষু বুজিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকে এবং দুগ্ধপান শেষ হইলে স্নেহে উভয়ের অঙ্গ চাটে।

এ সকল লীলা দেখিয়া জননীদ্বয়ের আনন্দের সীমা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া খেলা করেন, তখন

সেঁই ধূলিধূসরিত দিগম্বর গোপালমূর্ত্তিটির কি যে অপূর্ব্ব শোভা হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহা দেখিয়া জননী মনে মনে আহ্লাদিত হইলেও বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বালককে ভর্ৎসনা করেন। কৃষ্ণ তাহাতে যেন কতই গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? ইহারই মধ্যে ওষ্ঠাধর টিপিয়া একটু একটু হাসেন আর চক্ষের তারা দু'টি এদিকে সেদিকে ফিরাইয়া কপোল-বিলম্বিত অলকাবলির ভিতর দিয়া সমস্ত চাহিয়া দেখেন। তখনকার সে দৃশ্য দেখিয়া ব্রজকামিনীগণ কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না।

দিনে দিনে নন্দনন্দনের বিদ্যা বাড়িতে লাগিল। ব্রজগোপীদিগের কাহারও গৃহে আর ছানা মাখন রাখিবার সাধ্য নাই। কৃষ্ণ কাহারও বাড়ীতে গিয়া মুহূর্ত্তকাল থাকিয়া আসিলেই পরক্ষণে দেখা যাইত যে ছানা, মাখন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ পাত্রগুলি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে! কাহারও বা জলের কলসীগুলিতে ছিদ্র হইয়াছে, কাহারও উনন নিবিয়া গিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণের এই সকল অত্যাচারে ব্রজাঙ্গনাদিগের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহারা সকলে নন্দরাণীর নিকটে আসিয়া বলিতেন, "দেখ রাণি, তোমার কৃষ্ণের যত কীর্ত্তি শোন। আমাদের গোদোহনের পূর্ব্বেই কৃষ্ণ গিয়া বৎসসকল খুলিয়া দেন, আর উহারা সমস্ত দুগ্ধ খাইয়া ফেলে। তাহাতে কেহ কিছু বলিলে কৃষ্ণ সুযোগমত ঘরে যাইয়া নিদ্রিত শিশুকে নখাঘাত করিয়া কাঁদাইয়া আসেন। এ সব ত আছেই, তদ্ভিন্ন চুরি করিতেও তোমার ছেলেটি

বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন। তাঁহার ভয়ে আমরা দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডগুলি উচ্চ শিকায় তুলিয়া রাখি, কৃষ্ণ সে সকল হাতে নাগাল না পাইয়া পিঁড়ির উপর পিঁড়ি তার উপর পিঁড়ি সাজাইয়া চুরির ব্যবস্থা করিয়া লয়েন। নিজে কিছু খান না, সমস্ত খাদ্য বানরদিগকে বিলাইয়া দেন। যদি কেহ তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিতে যায়, কৃষ্ণ অমনি বলিয়া উঠেন "তুই চোর, আমি এ বাড়ীর স্বামী।" কখন বা ক্রোধভরে হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলেন, কখন বা জ্বলন্ত চুল্লীতে জল ঢালিয়া দেন। তোমার কৃষ্ণ আমাদের সকলের বাড়ীতে এইরূপ নানা অত্যাচার করিয়া বেড়ান কিন্তু তোমার নিকটে নিতান্ত সাধুটির ন্যায় থাকেন।"

গোপীগণ যখন জননীর নিকট এসব কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, কৃষ্ণ তখন যেন চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তখনকার তাঁহার সভয় নয়ন ও অপ্রতিভ মুখের ভাব দেখিয়া গোপীদিগের অন্তরে যে কি প্রীতি জাগিয়া উঠিত তাহা বলিয়া বুঝান যায় না।

একদিন গোপবালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে যশোদার নিকটে আসিয়া বলিল, "তোমার কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে।" জননী কৃষ্ণের হাত ধরিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাতা হাত ধরিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের দুই চক্ষু ভয়ে ব্যাকুল হইল। বলরাম বলিলেন, "হাঁ মা, আমিও দেখিয়াছি, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে।" তখন জননী কৃষ্ণকে আরও কঠোরভাবে তিরস্কার করিতে

লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না মা, আমি মাটি খাই নাই, ইহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে, এই দেখ আমার মুখ।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলেন, যশোদা তাঁহার মুখের মধ্যে অখিল বিশ্বসংসার দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে ব্রজপুরী, নন্দ, যশোদা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান! দেখিয়া যশোদা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন বুঝি বা স্বপ্ন দেখিতেছেন।

"বদন মেলিয়া রাণী গোপাল পানে চায়।
মুখমাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতরে সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥"

(উদ্ধব দাস)

নন্দরাণী পরমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন যে উহা স্বপ্ন নয়। রাণীর দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মনে মনে বলিতে

লাগিলেন, "ইহা কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য, কৃষ্ণ সামান্য বালক নয়। আমি যে ইঁহাকে আমার তনয় জ্ঞান করিতেছি ইহা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ ; ইনিই পরব্রহ্ম, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই লীলাময় ভগবান্।" এইরূপে জননীর তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তখনই আবার এমন মায়া বিস্তার করিলেন যে, তাহাতে মাতার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি এইমাত্র যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন তাহার কোনও সংস্কার তাঁহার মনে রহিল না! যশোদা পূর্ব্ববৎ অপত্যস্নেহে পরিপূর্ণ হইলেন এবং কৃষ্ণকে আপনার পুত্র বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।

ননীগোপাল

নন্দের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ এখন চারিবৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলা-ধূলা করিয়াই তাঁহার অনেক সময় কাটে, তা বলিয়া সর-নবনীর পাত্রগুলির প্রতি যে একেবারেই দৃষ্টি নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। গৃহে দধি দুগ্ধ ক্ষীর নবনীর অভাব নাই, গোপালও হাত পাতিয়াই আছেন। ঘরে অল্প সময়ই থাকেন কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে এক একবার আসিয়া নবনীর ভাণ্ডগুলি না দেখিয়া গেলে যেন প্রাণটা কেমন কেমন করে। কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে দধিমন্থনের শব্দ কাণে শুনিবামাত্র অমনি দাদা বলরামকে সঙ্গে করিয়া মায়ের নিকট ছুটিয়া আসেন এবং

'দাও ননী, দাও ননী' বলিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করেন। নন্দরাণী দুইজনের হাত পূর্ণ করিয়া ক্ষীর নবনী দেন, আর দুই ভাই খাইতে খাইতে নাচিতে থাকেন।

"দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥"

(ঘনরাম দাস)

গোপাল কত ভঙ্গী করিয়া নাচেন, নাচিতে নাচিতে আবার মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন। দুই হাতে নবনী, সুতরাং হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিতে পারেন না, তাই মাথা হেঁট করিয়া বাহুদ্বারা চক্ষু দুটি ঢাকিয়া বলেন, "মা, এই দেখ আমি লুকাইলাম।" মাতা বলেন, "তাইত, বাছা আমার লুকাইয়াছে, আমিত বাছা তোমাকে দেখিতেই পাইতেছি না!" তখন

গোপাল মাথা তুলিয়া জননীর মুখের পানে চাহিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসেন আর নাচিতে থাকেন। সে নাচ দেখে কে! যশোদা একলা দেখিয়া তৃপ্তি পান না, তাই রোহিণী ও অন্যান্য গোপীদিগকে ডাকিয়া আনেন। তাঁহারা আসিলে রাণী করতালি দিতে দিতে বলেন-

"নাচেরে নাচেরে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর॥
তাতা থৈয়া তাতা থৈয়া বলে নন্দরাণী।
করতালি দিয়া নাচে রাম যাদুমণি॥"

গোপাল নাচিতেছেন। দুই করে মাখন লইয়া মনের সুখে খাইতেছেন আর নাচিতেছেন। অরুণ অধরে ও চিবুকে নবনী লাগিয়া রহিয়াছে, কতক বা শ্যাম অঙ্গ বাহিয়া পড়িতেছে, মনের আনন্দে গোপাল নাচিতেছেন। ভ্রমর-কৃষ্ণ কুটিল কুন্তলে জননী মণিমুক্তা দিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়া দিয়াছেন, গলায় মতির হার দুলিতেছে, তাহাতে রত্ন-বিজড়িত বাঘ-নখ শোভা পাইতেছে, গোপাল নাচিতেছেন। কটিতে কিঙ্কিণী কিনি কিনি রোল তুলিয়াছে, চরণে নূপুর রুণু ঝুনু বাজিতেছে, গোপাল নাচিতেছেন। ব্রজবধূগণ মিলিয়া ভালিরে ভালিরে বলিয়া করতালি দিতেছেন আর গোপাল নাচিতেছেন।

"নাচত মোহন গোপাল।
বরজবধূ মেলি দেই করতালি
বোলই ভালিরে ভাল॥"

(বংশীবদন)

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বিচিত্র মধুর লীলা করিয়া ব্রজ-জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চপলতাও উত্তরোত্তর বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এক দিবস কৃষ্ণকে নবনী চুরি করিতে দেখিয়া কোনও গোপী তাঁহাকে হাতে কলমে ধরিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণের হাতে, মুখে ও চিবুকে নবনী লাগিয়া রহিয়াছে, এমত অবস্থায় সেই রমণী তাঁহার হাত ধরিয়া মাতা যশোদার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই দেখ রাণি, তোমার ছেলেটি কেমন সাধু!" যশোদা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "সে কিগো, এ যে তোমার ছেলে!" সেই গোপী চাহিয়া দেখেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার নিজের পুত্রকেই ধরিয়া আনিয়াছেন। তখন তিনি অপ্রতিভ হইয়া ছেলেটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু একি? পথে গিয়া দেখেন যে, তিনি কৃষ্ণকেই হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন! তখন শঠের শিরোমণি কৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ, আজি তোমাকে কেমন জব্দ করিলাম। যেমন আমাকে ধরাইয়া দিতে গিয়াছিলে তেমন তোমারই ছেলেকে ধরাইয়া দিলাম। তুমি যদি পুনরায় এরূপ কর তবে আর একদিন তোমার স্বামীকে ধরাইয়া দিব। সাবধান, এ সব কাহাকেও কিছু বলিও না।"

কণ্বমুনি ও শ্রীকৃষ্ণ

এক দিবস মুনিবর কণ্ব আসিয়া নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। মুনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

মথুরামণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু কোন্ স্থানে কিরূপ আবির্ভাব তাহা সবিশেষ জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক তিনি অনির্দ্দিষ্টভাবে মথুরামণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে গোকুলে উপস্থিত হইয়া নন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মুনি বাল-গোপালের উপাসক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারে বসিলেন। তখন কৃষ্ণ অন্যান্য বালকের সহিত খেলা-ধূলা করিতেছিলেন। মুনিবর আহারে বসিয়াই অন্নব্যঞ্জন গোপাল-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় ইষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন। কিন্তু চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই দেখেন যে নন্দের ধূলামাখা কাল ছেলেটি থালা হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া খাইতেছে। দেখিয়াই ত মুনি হায় হায় করিয়া উঠিলেন। যশোদা বালকের এই কার্য্য দেখিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; মুনিবর তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

নন্দ মুনিবরের পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া পুনর্ব্বার রন্ধন করাইলেন। যশোদা পুত্রকে লইয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। প্রতিবেশিনী গোপিকাগণ নানা কথা বলিয়া কৃষ্ণকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকে কে ভুলায়! মুনিবর পুনরায় আহারে বসিয়া অন্ন নিবেদন করিয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখেন যে, আবার বালক অন্ন খাইতেছে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ভুলাইতে গিয়াছিলেন, কৃষ্ণ অনায়াসে তাঁহাদের সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া আসিয়াছেন! এইবার গোপরাজ স্বচক্ষে পুত্রের কীর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সুতরাং ক্রোধে অধীর হইয়া তনয়কে

বিশেষ শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। মুনি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া থামাইলেন এবং বলিলেন, "বিধাতা যে দিন যাহা কপালে লিখিয়াছেন তাহাই ঘটিবে, ইহাতে দুঃখিত হইবেন না ; গৃহে যদি ফল-মূল কিছু থাকে, আনিয়া দিন, তাহাই গোপালকে নিবেদন করিব।" কিন্তু গোপরাজের কাতরতা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় রন্ধন করিতে হইল।

এবার দুষ্ট ছেলেকে লইয়া গোপিকারা ঘরের ভিতরে শোয়াইয়া রাখিলেন। বাহির হইতে দুয়ার বন্ধ করা হইল, এবং কড়া পাহারা চলিতে লাগিল। রন্ধন শেষ হইলে মুনি অন্নব্যঞ্জন বাড়িয়া লইয়া এবার নিশ্চিন্তমনে গোপালের নামে নিবেদন করিলেন। সহসা কোথা হইতে দুষ্ট বালক আসিয়া আবার উপস্থিত ! যাঁহারা পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা সকলেই অঘোর নিদ্রায় অচেতন ! বালককে পুনর্ব্বার অন্ন গ্রহণ করিতে দেখিয়া মুনিবর হায় হায় করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি এত চঞ্চল হইতেছ কেন ? তুমিইত আমাকে বার বার ডাকিতেছ, তাই আমি সকল বাধা পায়ে ঠেলিয়া তোমার কাছে আসিতেছি। আমার নাম ধরিয়া কেহ ডাকিলে আমি যে স্থির থাকিতে পারি না, আমার নামে কিছু নিবেদন করিলে তাহাও গ্রহণ না করিয়া পারি না। মুনি, স্থির হও। এই দেখ, তুমি যাহাকে অন্ন নিবেদন করিয়াছ আমিই সে।" অমনি মুনির দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। মুনিবর সেই নব-জলধর-রুচি নিরুপমোজ্জ্বল বাল-

গোপাল-মূর্ত্তি স্বরূপতঃ দর্শন করিয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোপালের প্রসাদান্ন মুখে দিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, দুই গণ্ড বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ এক এক বার প্রসাদ মুখে দেন আর পরানন্দে বিভোর হইয়া "আহারে! কি সুধারে!" বলিয়া উহা মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করেন। কৃষ্ণাধরচ্যুত প্রসাদভক্ষণে ব্রাহ্মণ একেবারে বিহ্বল হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন আর হুঙ্কার করিয়া বলিতেছেন — "জয় গোপাল! জয় গোবিন্দ! জয় ব্রহ্ম গোপাল! জয় ব্রহ্ম গোপাল!"

মুনির নৃত্য-গীত-হুঙ্কারে সকলে জাগরিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্রীকরস্পর্শে মুনিকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিতে ইঙ্গিত করিয়া দ্রুত পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্টভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ অতি সাবধানে আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। নন্দমহারাজ আসিয়া দেখিলেন যে, এবারে মুনিবর নির্ব্বিঘ্নে আহার করিতে পারিয়াছেন। মুনিবর কণ্ব অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র নন্দের নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দধিভাণ্ডভঞ্জন

এক দিবস গৃহদাসীগণ কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দরাণী নিজ হস্তে দধি মন্থন করিতেছিলেন। দধি মন্থন করিতে

করিতে তাঁহার কর-ভূষণের এক প্রকার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি হইতেছিল, কুন্তলদ্বয় কপোল স্পর্শ করিয়া দুলিতেছিল। তাঁহার শিথিল কবরী হইতে সহসা মল্লিকার দাম খসিয়া পড়িল এবং অলকাবলী-আকুলিত সুঠাম ললাটে বিন্দু বিন্দু শ্রম-বিন্দু দেখা দিল। কৃষ্ণের যাবতীয় বাল-চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে বাৎসল্যে ভরপূর হইয়া রাণী দধি মন্থন করিতেছিলেন। স্তন-ক্ষীরে তাঁহার উত্তরীয় বসন ভিজিয়া গিয়াছিল; প্রতি অঙ্গের ঈষৎ কম্পনে যেন বাৎসল্যের হিল্লোল খেলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ স্তন্য পান করিবার অভিলাষে জননীর নিকট আসিলেন এবং দুই হস্তে দধি-মন্থনের দণ্ডটি ধরিয়া মন্থন স্থগিত করিয়া দিলেন। যশোদা গোপালকে স্নেহভরে কোলে বসাইয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাণী উনানের উপরে যে দুগ্ধ চাপাইয়া আসিয়াছিলেন অগ্নির উত্তাপে তাহা উত্‌লাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি অমনি গোপালের মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়া দ্রুতপদে সেখানে গেলেন। স্তন্যপানের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত না হইতেই জননীর এই রূপে সহসা চলিয়া যাওয়াতে কৃষ্ণের বিষম ক্রোধ হইল। কৃষ্ণ ক্রোধে কম্পমান অরুণ ওষ্ঠাধর দন্ত দ্বারা দংশন করিতে করিতে একটি শিলাখণ্ড লইয়া দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একান্তে নবনী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাতা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, দধির ভাণ্ডটি ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে, আর সমস্ত দধি মাটিতে গড়াইতেছে।

দেখিয়া বুঝিলেন, ইহা পুত্রেরই কর্ম্ম। কিন্তু কৃষ্ণ সেখানে নাই; ভয়ে কোথাও পলাইয়াছে ভাবিয়া যশোদা হাসিতে লাগিলেন। পরে ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ একটি বিপর্য্যস্ত উদূখলের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চ শিকা হইতে নবনী পাড়িতেছেন আর বানরদিগকে খাওয়াইতেছেন।

কৃষ্ণ ভগবান হইলেও কার্য্যটি করিতেছিলেন—চুরি। তাই জননীর ভয়ে তাঁহার চক্ষু দু'টি চঞ্চল হইয়াছিল এবং এই বুঝি জননী আসিতেছেন এরূপ মনে করিয়া তিনি চকিতভাবে কেবল এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছিলেন। যশোদা ধীরে ধীরে বালকের পশ্চাৎ দিকে গমন করিলেন। কৃষ্ণ একবার পিছনের দিকে চাহিতেই দেখেন যে, মাতা যষ্টিহস্তে আসিতেছেন; অমনি উদূখল হইতে নামিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিলেন। যশোদা তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন কিন্তু ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিলেন না। ছেলেটি যে সহজে ধরা দিবার পাত্র নয়!

"দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ নয়নে রাণী চাহে চারি ভিত॥
হেদেরে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায়॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিলভুবনপতি যায় পলাইয়া॥

এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পলাঞা যায় জননীর ডরে ॥”

(অজ্ঞাত)

বিপুলনিতম্বা জননী যশোদা চপল বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর চলিতে পারিতেছেন না। বালককে ধরা তাঁহার শক্তিতে কুলাইয়া উঠিল না। বস্তুতই নিজে ধরা না দিলে এমন ছেলেকে কেই বা ধরিতে পারে! অবশেষে জননীর শ্রম দেখিয়া কৃষ্ণ নিজেই ধরা দিলেন। কৃষ্ণ অপরাধ করিয়াছিলেন, তাই জননী হাত ধরিবা মাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হস্তে চক্ষু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষের অঞ্জন অশ্রুতে মিশিয়া স্বচ্ছ গণ্ডদ্বয়ে পরিব্যাপ্ত হইল। কৃষ্ণ কেবল রোদন করিতেছেন আর ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে এক এক বার জননীর মুখ-পানে চাহিতেছেন। স্নেহময়ী যশোদা বাছার গায়ে হাত তুলিতে পারিলেন না, তাঁহার হাতের যষ্টি হাতেই রহিল। অবশেষে তিনি কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখাই উপযুক্ত শাস্তি বিবেচনা করিলেন।

যশোদা এক গাছি রজ্জু লইয়া কৃষ্ণের উদর বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা দুই অঙ্গুলি কম হইল। তখন অন্য রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত যোগ করিলেন, তাহাতেও কম পড়িল। রাণী আবার আর একটি রজ্জু আনিয়া তাহার সঙ্গে মিলাইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাতেও কুলাইল না, ঠিক দুই অঙ্গুলি কম হইল! অবশেষে গৃহে যত রজ্জু ছিল রাণী তৎসমুদয় যোড়া দিয়া আনিলেন কিন্তু বাঁধিবার কালে

তাহাতেও দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। ইহাতে যশোদা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। তিনি কৃষ্ণকে বাঁধিতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিলেন না; তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধা জননী বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এবালকটি নিজে বাঁধা না পড়িলে ইঁহাকে কেহই বাঁধিতে পারে না।

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোদার বাৎসল্যে বাঁধাই ছিলেন। তথাপি কিছুক্ষণ জননীর সহিত রঙ্গ করিয়া এবং তাঁহাকে শ্রান্ত দেখিয়া অবশেষে স্নেহময়ীর বশে আসিলেন। তখন যশোদা অনায়াসেই কৃষ্ণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বন্ধন-রজ্জু একটা উদ্‌খলের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

যমলার্জ্জুন ভঙ্গ

জননী চক্ষের অন্তরাল হইবা মাত্র কৃষ্ণ উদ্‌খলটা টানিতে টানিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং কিছু দূরে দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষ দেখিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। উদরে রজ্জু বাঁধা, সেই রজ্জু আবার উদ্‌খলে আবদ্ধ। কৃষ্ণ সুঠাম শ্যামল নধর অঙ্গটি হেলাইয়া দোলাইয়া উচ্চ-নীচ ভূমির উপর দিয়া সেই গুরু-ভার উদ্‌খলটা টানিতে টানিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ বৃক্ষ দুইটি যেন দুইটি যমজ ভ্রাতার ন্যায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল। আমাদের নন্দমহারাজের অদ্ভুত বালকটি যাবেন ত

সেই দু'টি গাছের মধ্য দিয়াই চলিলেন ! তাহাতে উদূখলটা আড় হইয়া দুই গাছে ঠেকিয়া রহিল, সুতরাং কৃষ্ণের কোমরের রজ্জুতে টান পড়িল। রাখাল বালকেরা দূর হইতে মজা দেখিয়া করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাদের সেই হাসি বিস্ময়ে পরিণত হইল। কৃষ্ণ যে উদূখলটা টানিতেছিলেন সেই টানেই বৃক্ষ দুইটির মূলোৎপাটিত হওয়াতে উহারা প্রচণ্ড শব্দ করিয়া কৃষ্ণের দুই পাশে পড়িয়া গেল। বালকেরা ত দেখিয়া অবাক্।

ঐ বৃক্ষ দুইটি পূর্ব্ব জন্মে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। উহাদের নাম ছিল নলকূবর ও মণিগ্রীব। উহারা কোনও গুরুতর অপরাধ করাতে দেবর্ষি নারদের শাপে ঐ স্থানে বৃক্ষ হইয়া জন্মিয়াছিল। দেবর্ষি অভিসম্পাত করিয়াই কৃপাপূর্ব্বক ইহাও বলিয়াছিলেন যে, "ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎকার লাভে তোমাদের মুক্তিলাভ হইবে।" বৃক্ষদ্বয় পতিত হইবা মাত্র উহাদের মধ্য হইতে নলকূবর ও মণিগ্রীব দিব্যোজ্জ্বলমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন :—

"প্রভো ! আপনি সকল কল্যাণের অধিপতি, অতএব হে পরমকল্যাণ ! আপনাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বমঙ্গল ! আপনাকে নমস্কার। আপনি বাসুদেব, শান্তমূর্ত্তি এবং যদুদিগের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্ ! আমাদের বাক্য আপনার গুণানুকীর্ত্তনে রত থাকুক, আমাদের শ্রবণ

আপনার কথাশ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদের হস্ত আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত হউক, আমাদের মন আপনার চরণারবিন্দস্মরণে নিবিষ্ট থাকুক এবং আমাদের নয়ন আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধু ভক্তগণের দর্শনে তৎপর হউক।”

এইরূপ স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্ত হইয়া দুই ভাই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং কিছু দূর যাইতে না যাইতেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাখালবালকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আরও বিস্ময়ান্বিত হইল।

ইতিমধ্যে নন্দাদি গোপগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের উদূখলে বাঁধা ছেলেটি নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁহার দুই পার্শ্বে বিশাল অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ লোক, সুতরাং এই ঘটনাকে দৈব উৎপাত ভিন্ন অন্য কিছু সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। রাখালবালকেরা স্বচক্ষে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তৎসমুদয় তাহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সকলকে বলিল, কিন্তু কেহই তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না।

অতঃপর নন্দমহারাজ স্বহস্তে বালকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ বন্ধনমুক্ত হইয়া পিতার স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যশোদা বুঝিলেন, ছেলেটি কি দুরন্ত ছেলে!

ফলবিক্রয়িনী

এক দিবস মথুরা হইতে একটী স্ত্রীলোক ফল বিক্রয় করিতে গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পথে পথে "ফল লেবে গো, ফল লেবে গো" বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। যত ব্রজের বালক তাহার সঙ্গ লইল এবং সকলেই তাহার নিকট হইতে ফল কিনিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণও ফল কিনিবার জন্য মায়ের কাছে চাহিয়া অঞ্জলি পূরিয়া ধান্য লইয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে পথেই প্রায় সমস্ত ধান্য অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িয়া গেল, হাতে অতি অল্পই কয়েকটা অবশিষ্ট রহিল। কৃষ্ণ তাহাই ফলবিক্রয়িনীর পসারে ফেলিয়া দিয়া ফল চাহিলেন।

"শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হইতে পড়িতে পড়িতে।
পসারি নিকটে আসি ফল দাও বলে হাসি
ধান্য দিল ফলহারী হাতে॥"

(উদ্ধব দাস)

পসারিণী যশোদাতুলালের চাঁদমুখ পানে চাহিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এমন সোণার চাঁদ ছেলে যে ভাগ্যবতী রমণী গর্ভে ধরিয়াছেন, ইচ্ছা হয় যে তাঁহার চরণের দাসী হইয়া থাকি।" পসারিণী কৃষ্ণের মুখের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল :—

"ও মোর সোণার চাঁদ কি তোর মায়ের নাম
কার ঘরে হইলা উৎপতি।
বহুকাল তপ করি কে পূজিল হরগৌরী
কোন্ পুণ্য কৈলা সেই সতী॥
তোমারে করিয়া কোলে কত শত চুম্ব দিলে
নয়ানের জলে গেল ভাসি।
পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চাঁদমুখে
মুই যাই হব তার দাসী॥"
(ঘনরাম দাস)

পসারিণী সর্ব্ব-আকর্ষণসার নিরুপম কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ হইয়া পরম স্নেহভরে তাঁহার দুই হস্ত ফলে পূর্ণ করিয়া দিল। সর্ব্ব-ফলদাতা ভগবান্ তাহাকে কৃপা করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

"এত কহি ফল-হারী ফল দেন কর ভরি
প্রেম-ভরে গর গর চিত।
কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে পথে
আসি নিজ গৃহে উপনীত॥"

কৃষ্ণ চলিয়া আসিলে সেই পসারিণী আপনার পসারের দিকে চাহিয়া দেখে যে শূন্য পসার বিবিধ মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে!

শ্রীবৃন্দাবন গমন

নন্দমহারাজ যে গোকুলে বাস করিতেছিলেন তাহা মহাবনের অন্তর্গত। ঐ স্থানে পুনঃ পুনঃ নানা প্রকার উৎপাত ঘটিতেছে

দেখিয়া গোপগণ বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া গোকুলের হিতার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে উপনন্দ নামক গোপ জ্ঞানী, বহুদর্শী ও বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, যদি গোকুলের হিত করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমাদের এস্থান হইতে সমস্ত লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। বালঘাতিনী পূতনার হস্ত হইতে নন্দের বালকটি দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছে। আর দৈবানুগ্রহেই সেই শকটটা বালকের উপরে পতিত হয় নাই। শিশুটি চক্রবায়ু-কর্ত্তৃক আকাশে নীত হইয়া শিলার উপরে পড়িয়াও যে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে, ইহাও কেবল মাত্র শ্রীহরির কৃপা ও আমাদের বহুভাগ্য বলিতে হইবে। আবার অর্জ্জুনবৃক্ষ দুইটি সহসা বিনা বাতাসে ভূমিসাৎ হইল, ভাগ্যে ত শিশুর অঙ্গে আঘাত লাগে নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, আমাদের এই মহাবন পরিত্যাগ করাই ভগবানের ইচ্ছা। বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থান। তথায় প্রচুর তৃণ-গুল্ম-লতা-পরিশোভিত অনেক সুন্দর সুন্দর বন, প্রান্তর ও পর্ব্বত আছে। উক্ত স্থান গোপ-গোপীগণের সুখসেব্য ও গোচারণের উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নাই। সমস্ত মথুরামণ্ডলে এমন রমণীয় স্থান আর দৃষ্ট হয় না। চল, অদ্যই সেখানে গমন করা যাউক, শকটসকল যোজনা কর, আর বিলম্ব করা উচিত বোধ করিতেছি না। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, গোধনসকল অগ্রে পাঠাও।"

উপনন্দের ঐ সকল কথা শুনিয়া গোপগণ মহোৎসাহে

বৃন্দাবনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব শকটসমূহ যোজনা করিয়া তদুপরি সমুদয় গৃহোপকরণ উঠাইয়া লইলেন। অসংখ্য অসংখ্য শকট আবালবৃদ্ধ গোপগোপীগণকে বহন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। গোধনসকল অগ্রে করিয়া গোপগণ মহোল্লাসে তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে ও শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই হস্তে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ বিচিত্র বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। শকট-সকল চলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা সমস্বরে কৃষ্ণ-লীলা গান করিতে লাগিলেন। যশোদা ও রোহিণী রামকৃষ্ণের সহিত এক পরম রমণীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এইরূপ বিচিত্র মনোহর শোভা-যাত্রা করিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা অবশেষে গিয়া বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন। মনোহর বন-উপবন-গিরি-প্রান্তর-সুশোভিত সুজল-সুফল-সুখময় বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া গোপগোপীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা তথায় মনের আনন্দে গোকুলের বসতিস্থান করি-লেন। সেই স্থানে তাঁহাদের শকটসকল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শোভা পাইতে লাগিল। বৃন্দাবন, গিরিগোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন অবলোকন করিয়া রাম ও কৃষ্ণের পরম প্রীতি জন্মিল। তাঁহা-দিগকে লইয়া ব্রজবাসিগণ পরম সুখে বৃন্দারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

গো-দোহন

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গো-দোহনের উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইলেন। নন্দমহারাজ ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডাকাইয়া কৃষ্ণ-বলরামের হস্তে গো-দোহনভাণ্ড অর্পণের শুভ দিন ধার্য্য করিলেন। তদুপলক্ষে এক মহৎ উৎসবের আয়োজন করা হইল। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী ও ব্রাহ্মণ সজ্জন নিমন্ত্রিত হইয়া নন্দালয়ে আগমন করিলেন। পুষ্প, পল্লব, পূর্ণঘট ও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদিদ্বারা গোষ্ঠ সাজান হইল। গোশালায় বিবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ নানা উপচারে গোষ্ঠ-পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দরাণী ও রোহিণীদেবী অন্যান্য গোপাঙ্গনাদিগের সহিত মিলিয়া কৃষ্ণ-বলরামের অঙ্গে তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া সুবাসিত জলে তাঁহাদের স্নান করাইলেন। গোষ্ঠ-পূজা শেষ হইলে পুরোহিতগণ বালকদ্বয়ের হস্তে গো-দোহনভাণ্ড অর্পণের অনুমতি প্রদান করিলেন। নন্দমহারাজ বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত দুইটি দুগ্ধবতী গাভী আনাইয়া রাম-কৃষ্ণের করে দোহন-ভাণ্ড দিলেন। দুই ভাই সাতিশয় দক্ষতার সহিত পরমানন্দে দোহন করিতে লাগিলেন।

"তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই।
ধবলী শ্যামলী বৎস সহিত তথাই॥
সুরভি-সন্ততি সেই মহা দুগ্ধবতী।
স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী॥

দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া।
দোহন করিলা গাভী আনন্দিত হৈয়া॥
দোহাকার দুগ্ধ-ভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল।
প্রথম দোহন-দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল॥"

(চৈতন্য দাস)

বৎস-চারণ

ইহার পর হইতে রাম-কৃষ্ণ প্রতিদিন পরম উৎসাহে গো-দোহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল গো-দোহন করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সমবয়স্ক অন্যান্য গোপ-বালকেরা প্রত্যহ কেমন স্ফূর্ত্তি করিয়া মাঠে বাছুর চরাইতে যায়, তাহারা কত খেলা খেলায়, আবার কেমন মনের আনন্দে হৈ হৈ করিতে করিতে নাচিয়া কুন্দিয়া বৎসগণ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে ; সে সব দেখিয়া শুনিয়া রামকৃষ্ণের প্রাণেও বৎস-চারণের সাধ জাগিয়া উঠিল।

কৃষ্ণ মায়ের কাছে যাইয়া বলিলেন, "মা, আর আর রাখাল-বালকদের মত আমাকে ধড়া চূড়া পরাইয়া দাও, আমার ভালে অলকা তিলকা, গলে বনমালা এবং হস্তে শিঙ্গা, বেণু ও বেত্র দিয়া রাখালবেশে সাজাইয়া দাও, আমি বাছুরি চরাইব। ঐ দেখ শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি সাজিয়া গোষ্ঠে যাইতেছে, আমিও গোষ্ঠে যাইব।"

"আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম স্থদাম দাম স্থবলাদি বলরাম
সবাই দাঁড়াইয়া রাজপথে ॥"

গোপালের কথা শুনিয়া মায়ের প্রাণ ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। তিনি এই 'ছুধের ছাওয়াল' গোষ্ঠে পাঠাইয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? নন্দ আসিয়া বৎস-চারণে অনুমতি দিলেন। বলিলেন, "আমরা বৈশ্যজাতি, গোচারণ আমাদিগের বৃত্তি, ইহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।" যশোদাও বুঝিলেন যে, গোপরাজ ঠিক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিতে যে তাঁহার প্রাণ প্রবোধ মানে না। রাণীর ছু'নয়নে স্নেহধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি করুণকণ্ঠে বলিলেন, "গোপাল, তুই এ সকল চঞ্চল বাছুর লইয়া কেমন করিয়া গোঠে যাইবি বাপ্? তোর কোমল চরণে না জানি কত কুশাঙ্কুর বিঁধিবে। আজ থাক্ বাবা, আর একটু বড় হও, তারপর ইচ্ছামত বৎস-চারণ করিও।"

"চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে যাইবে বনে
কোমল ছু'খানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥"

কিন্তু কৃষ্ণ মায়ের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। একবার মাথায় খেয়াল চাপিলে ত তাহা না করিয়া রক্ষা নাই! কৃষ্ণ মায়ের আঁচল ধরিয়া আবদার করিতে লাগিলেন, মুখ ফুলাইয়া কত কাঁদিলেন, কত চক্ষের জল ফেলিলেন, আবার জননীকে খুসি করিবার জন্য তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন, নিজে হাসিয়া মাকে হাসাইতে চেষ্টা করিলেন। যশোদা পরাস্ত হইলেন এবং গোপালকে গোষ্ঠের সাজে সাজাইতে বসিলেন।

"কাঁন্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দু'নয়নে
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী॥
স্তন-ক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদ-গদ কহে আজি রাখি যাহ তবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥"

(অজ্ঞাত)

নন্দরাণী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইয়া বলরামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "বলাই, আমার মাথার দিব্বি, তোমরা দূর বনে যাইও না, বাটীর নিকট নিকট থাকিয়া সাবধানে বাছুরি চরাইও। আর বৎস চরাইতে চরাইতে বেণু বাজাইও, আমি ঘরে বসিয়া তাহা শুনিব।" বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া অন্যান্য গোপবালকদিগের সহিত

বৎস-চারণে বহির্গত হইলেন। নন্দরাণী তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু অনুক্ষণ কৃষ্ণ-চিন্তা তাঁহার প্রাণ অধিকার করিয়া বসিল।

কৃষ্ণকে পাইয়া রাখালবালকদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বলরাম সকলকে লইয়া ব্রজভূমির অদূরে বৎস-চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন বা বেণু বাজাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও বা নূপুর ধ্বনিত করিয়া জোরে জোরে লম্ফ দেন। আবার কখন বা পশুপক্ষীর স্বর অনুকরণ করিয়া নানারূপ শব্দ করেন, কখনও বা সামান্য কথায় হাসিতে হাসিতে সকলে তৃণের উপর গড়াগড়ি যান। রামকৃষ্ণ এইরূপে বৎস-চারণ ও খেলা-ধূলা সাঙ্গ করিয়া বৎসগণ লইয়া, গৃহে ফিরিলেন, যশোদা-রোহিণীর প্রাণ এতক্ষণে সুস্থ হইল।

বৎসাসুরবধ

এইরূপে কৃষ্ণ-বলরাম প্রতিদিন শ্রীদামাদি গোপবালকদিগের সহিত ব্রজভূমির নিকটে নিকটে বৎস-চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একবার ঘরের বাহির হইতে পারিলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকেন। উন্মুক্ত নীলাকাশতলে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সুবিস্তৃত প্রান্তরে আসিয়া তাঁহাদের অঙ্গে স্ফূর্ত্তি ধরে না। তাঁহারা উল্লাসভরে কত নৃত্য করেন, কত প্রকার কৌতুকময় ক্রীড়ায় উন্মত্ত থাকেন তাহার বর্ণনা করা যায় না। সেই পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন ব্রজের

রাখালগণের আনন্দোৎফুল্ল মুখগুলি দেখিয়া তাহাদের সরল স্বচ্ছন্দ সানন্দ গতিবিধি ও লীলাখেলা দর্শন করিয়া দেবতারাও মুগ্ধনেত্রে গোষ্ঠের পানে চাহিয়া থাকেন।

একদা রাম-কৃষ্ণ সখাদিগের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরে বৎস-চারণ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন যে, একটা ভীষণ দৈত্য বৎস-রূপ ধরিয়া বাছুরের পালে মিশিয়া গেল। ঐ অসুর কংস কর্তৃক প্রেরিত ; সুবিধা পাইলেই রাম-কৃষ্ণের প্রাণনাশ করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কৃষ্ণ ত প্রতারিত হইবার পাত্র নহেন। তিনি ধীরে ধীরে, যেন কিছুই জানেন না, এইরূপভাবে বৎসপালের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সহসা ঐ বৎসাসুরের পশ্চাদ্‌ভাগের দুইপদ ও লাঙ্গুল একসঙ্গে ধরিয়া উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন। দেখিয়া রাখালবালকদের ত চক্ষু স্থির! এইরূপে ঘুরাইতে ঘুরাইতে যখন অসুরের প্রাণবায়ু বাহির হইল, তখন কৃষ্ণ উহাকে ঘূর্ণামান অবস্থাতেই নিক্ষেপ করিয়া একটা কপিত্থবৃক্ষের উপর ফেলিয়া দিলেন। অসুরের প্রকাণ্ড দেহের ভারে গাছটা মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া গোপবালকেরা বিস্মিত হইল। আকাশস্থ দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বকাসুরবধ

যতই দিন যাইতে লাগিল, বৎস চরাইতে চরাইতে রাম-কৃষ্ণের সাহস ততই বাড়িয়া চলিল। তাঁহারা দিন দিন দূর হইতে

দূরান্তরে গিয়া বৎস চরাইতে লাগিলেন। সে কথা যশোদার কাণে গেল। তিনি একদিন প্রভাতে উঠিয়া বলরামকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলাই, তোমরা নাকি এখন প্রত্যহ দূরবনে যাইয়া বাছুরি চরাও? আমি আর কৃষ্ণকে তোমাদের সঙ্গে যাইতে দিব না। আমার ননীগোপাল বাছুরি চরাইতে দূর বনে যাইবে, ইহা আমি প্রাণে সহ্য করিতে পারিব না।"

"গোপাল নাকি যাবে দূর বনে?
তবে আমি না জীব পরাণে॥
দধি-মন্থন কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে যাইয়া
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
গোপাল আমার পরাণ পুতলী।
তোমারে সঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই
তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি॥"

বলরাম বলিলেন, "মাগো, তুমি ভয় পাইও না। আমি বেলা অবসানে তোমার গোপাল তোমার কোলে আনিয়া দিব। কোনও চিন্তা করিও না। কৃষ্ণকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। তাহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিব, বার বার যাচিয়া খাওয়াইব, আর শিঙ্গাবেণু বাজাইয়া গো-চারণ শিখাইব। আমি নিমেষের তরেও তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিব না।"

"সঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।

আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি ॥”

যশোদা বলরামের কথা শুনিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালকে সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাজাইবেন কি !

“আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা ॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ ॥”

নন্দরাণী নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন, আর কৃষ্ণের বেশ করিতে পারিলেন না। তখন বলরাম যত্নপূর্ব্বক কানাইর চূড়া বাঁধিয়া দিলেন ; যে অঙ্গে যে আভরণ শোভা পায়, তাহা দিয়াই কৃষ্ণকে সাজাইতে লাগিলেন।

“গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাই-চূড়া বলাই বান্ধিল ॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার ॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে ॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া ॥”

(ঘনরাম দাস)

যশোদা একটু স্থির হইয়া গোপালকে কোলে বসাইলেন

এবং তাঁহার প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া দেবগণের নাম করিয়া করিয়া রক্ষা-মন্ত্র পড়িলেন। অতঃপর ললাটে গোময়ের ফোঁটা দিয়া বলরামের হাতে সঁপিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বলাইদাদার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে গিয়া আর আর গোপবালকদের সহিত মিলিলেন। বালকগণের আনন্দ-কোলাহলে ও শিঙ্গাবেণুর ধ্বনিতে ব্রজধাম আনন্দময় হইয়া উঠিল। তাহারা নাচিতে নাচিতে বৎসপাল লইয়া চলিল।

"প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর রেণু
সুর নর হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে যায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনাতীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুকবিশেষ॥
কেহ যায় বৃষছান্দে কেহ কারো চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনাকূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥"

নবীন রাখালসকল এইরূপে বৎস চরাইতে চরাইতে যমুনার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নানা রঙ্গে খেলা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতে লাগিল, বৎসকুলকেও জলপান করাইল। তাহারা তীরে উঠিবে এমন সময় চাহিয়া দেখে যে, বকের আকৃতি একটা প্রকাণ্ডকায় পক্ষী হা করিয়া তাহাদের দিকে দ্রুত আসিতেছে। পাখীটা যেন ছোট খাট একটা পাহাড়ের মত। উহার একটা ঠোঁট মাটিতে, আর একটা ঠোঁট আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, উহা কংসেরই প্রেরিত একটা অসুর। উহাকে দেখিয়া বালকেরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

অসুরটা দেখিতে দেখিতে আসিয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল, কিন্তু গিলিতে পারিল না। কৃষ্ণ বকাসুরের মুখের ভিতরে গিয়াই আগুনের গোলার ন্যায় উহার তালু-মূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন, অসুর সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বমন করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ সুস্থদেহে প্রশান্তভাবে দাঁড়াইয়া বকের তামাসা দেখিতে লাগিলেন। বকাসুর পুনর্ব্বার মহারোষে উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ তখন দুই হাতে বকের দুই ঠোঁট ধরিয়া উহাকে তৃণের ন্যায় চিরিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাখালগণের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহারা হত-বল হতবুদ্ধি হইয়া যেন কাষ্ঠের পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে বকাসুরের গ্রাস হইতে কৃষ্ণকে সুস্থদেহে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলের

ধড়ে প্রাণ আসিল। বকাসুরনিধনে কৃষ্ণের পরাক্রম দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল।

অতঃপর শিশুরাখালের দল কৃষ্ণকে মাঝে করিয়া শিঙ্গা বেণু বাজাইতে বাজাইতে, পাচনি ঘুরাইয়া নাচিতে নাচিতে, বৎসপাল ফিরাইয়া গৃহপানে ছুটিল। তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, মাথার চূড়া এদিকে ওদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, বসন ভূষণের পারিপাট্য বিনষ্ট হইয়াছে, অলকা তিলকা আধ আধ মুছিয়া গিয়াছে, কুটিল কুন্তল আউলাইয়া চক্ষের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ ম্লান ও স্বেদযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অবসাদের কোনও চিহ্ন নাই। তাহারা যেন দিগ্বিজয় করিয়া মহা-উল্লাসে গৃহে ফিরিতেছে। জননীগণ পথের দিকে চাহিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা বেণুরব শুনিবামাত্র অগ্রসর হইয়া আপন আপন পুত্রকে গৃহে লইয়া গেলেন। তাহাদের মুখে কৃষ্ণকর্ত্তৃক বকাসুরনিধনের কথা শুনিয়া গোপ-গোপীগণ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিশুর দেহে দেবতা আবির্ভূত হইয়া এসকল অদ্ভুত কার্য্য করাইতেছেন। নতুবা বালকের কি সাধ্য যে, এরূপ অসাধ্য-সাধন করিতে পারে!

আর এক দিনের কথা

আজ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বলরাম শিঙ্গাধ্বনি করিলেন। বলরামের শিঙ্গাধ্বনি শুনিয়া গোয়ালপাড়া জাগিল, প্রতি গোশালায় হাম্বা হাম্বা রব উঠিল।

"সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গায় জাগিল গোয়ালপাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে॥"

(বলরাম দাস)

দেখিতে দেখিতে শত শত ব্রজের রাখাল সাজিয়া গুজিয়া আপন আপন বৎসগণসহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। নন্দ-মহারাজ আজ স্বহস্তে কৃষ্ণবলরামকে গোষ্ঠের সাজে সাজাইতে আসিলেন। তিনি কৃষ্ণকে পীত ধড়া ও বলরামকে নীল বসন কটি আঁটিয়া অপরূপ ছাঁদে পরাইয়া দিলেন। যশোদা ও রোহিণী আসিয়া বাছাদের সুন্দর ললাটে মনোহর তিলক রচনা করিয়া দিলেন, আকর্ণবিস্তৃত ভ্রূযুগল বেষ্টন করিয়া জুল্‌ফির নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া বিন্দু বিন্দু চন্দনের বিন্দু দিয়া সাজাইলেন। নাসিকায় উজ্জ্বল মুকুতা পরাইলেন, মস্তকে শিখিচন্দ্র দিয়া চূড়া বাঁধিলেন। গলায়, গুঞ্জাহার ও বনমালা পরাইলেন এবং কোলে বসাইয়া রাঙ্গা চরণে নূপুর পরাইয়া দিলেন। নূপুর পরা হইলে বলরাম জননীর ক্রোড় হইতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার পায়ের নূপুর রুণুঝুনু বাজিয়া উঠিল। অমনি কৃষ্ণও মায়ের কোল ছাড়িয়া গমনোদ্যত হইলেন। যশোদা গোপালকে গাঢ়স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘন ঘন তাঁহার চাঁদমুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণী এক একবার গোপালকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন আবার টানিয়া বুকে ধরেন। অবশেষে

বলরামের উত্তেজনা-বাক্যে তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রক্ষা-মন্ত্র পড়িতে ও ভালে গোময়ের ফোঁটা দিতে ভুলিলেন না।

যশোদা বলরামের নীল ধড়ার অঞ্চলে ক্ষীর সর নবনী বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "বলাই, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর যে, গোপালকে সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে রাখিবে। এই যে ক্ষীর নবনী দিলাম, ইহা তুমি আগে খাইও, তারপর আর আর শিশুগণকে খাওয়াইবে, সর্ব্বশেষে গোপালের মুখে দিও। বাছা আমার যত ব্রজরাখালের এঁটো খাইতে বড় ভালবাসে।" বলিতে বলিতে রাণীর দু'নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। কৃষ্ণবলরাম জননীদ্বয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। আগে আগে যূথে যূথে অগণিত বৎস হাম্বা হাম্বা রব করিতে করিতে চলিল, আর ব্রজবালকগণ পাছে পাছে হৈ হৈ শব্দ করিয়া যাইতে লাগিল। সকলেরই সমান বয়স, সমান বেশ ও একই ছাঁদে ধড়াচূড়া পরা। কৃষ্ণ, বলরামের বাম ভাগে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিলেন। মৃগনয়না ব্রজাঙ্গনাগণ অট্টালিকার ছাদে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠগমন দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ তাঁহাদিগের চক্ষুর অন্তরাল হইলেন, কিন্তু প্রাণের অন্তরাল হইতে পারিলেন না।

শিশু রাখালগণ নানা রঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইয়া যমুনার তীরে উপস্থিত হইল এবং নবীন কোমল তৃণময় প্রান্তরে

বৎসকুল ছাড়িয়া দিয়া বিবিধ কৌতুক-ক্রীড়ায় কাল কাটাইতে লাগিল।

"রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই চাঁদ মেঘে এক ঠাঁই
শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥
কেহ জলপানে ধায় অঞ্জলি পূরিয়া খায়
কেহ দেখে নিজ অঙ্গ-ছায়া।
যমুনা আনন্দ মন তরঙ্গ উঠিছে ঘন
দেখি ব্রজবালকের মায়া॥
কেহ হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বয়
কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
কেহ বায় শিঙ্গাবেণু বলে রাজা হৈল কানু
বলাই হইল তার মিত॥"

(বংশীবদন)

ব্রজরাখালগণ মিলিয়া কানাইকে রাজা সাজাইল এবং বলাইকে তাঁহার মন্ত্রী করিল। তাহারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কৌতুকভরে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, অঙ্গে অঙ্গে ঠেলাঠেলি করিয়া, পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যাদি ছুড়িয়া, কেহ বা কাহারও কাঁধে চড়িয়া, আবার পা ধরাধরি করিয়া আমোদ করিতে লাগিল। অতঃপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকলে মিলিয়া ঠিক করিল যে, আর এরূপভাবে খেলা করা হবে না, সমান সমান দুই দল হইয়া খেলিতে হইবে। এক দলের প্রধান হইবেন কানাই, আর এক দলে থাকিবেন বলাই। খেলায় যাহারা হারিবে,

তাহারা অপর দলের সকলকে কাঁধে করিয়া বংশীবটের তলা পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে।

"আরে মোর রাম কানাই।
যমুনাতীরের ছায়ে খেলে দোন ভাই॥
সবাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥
যে জন হারিবে ভাই কান্ধে করি নিবে।
বংশীবটের তলে গিয়া রাখিয়া আসিবে॥"

(ঘনরাম দাস)

তখন দুই ভাই আসিয়া দুই দিকে দাঁড়াইলেন। শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি কানাইর দিকে গেল, সুবল বলরামের দিকে গিয়া নাচিতে লাগিল। অবিলম্বে খেলা আরম্ভ হইল।

"এমত বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা॥
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই।
আপনি সাওলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই॥"

বলরামকে সম্মুখে দেখিয়া কৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়াই ছত্রভঙ্গ দিয়া খেলায় পরাজয় স্বীকার করিলেন। কৃষ্ণ সুবলকে, কেন জানি না, একটু বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে কাঁধে করিয়াও সুখ পাইতেন। তাই খেলায় হারিয়া তিনি মনের আনন্দে সুবলকে কাঁধে লইয়া বংশীবটের তলায় চলিলেন। শ্রীদাম বলরামকে কাঁধে লইল, কিন্তু কাঁধে করিয়া আর যে

চলিতে পারে না ! বলরামের যে প্রকাণ্ড বিশ্বম্ভর দেহ, শ্রীদাম তাহাকে বইতে পারিবে কেন ! শ্রীদামের সকল গা বাহিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল, শ্রীদাম আর শ্বাস ফেলিতে পারে না। সে অতি কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিল, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি !

শ্রীদামের ক্লেশের একশেষ হইতেছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, "আর আমি কানাইর দলে খেলিব না। কানাই জিতিলেও বলাইর ভয়ে ভয়ে হার মানে। ইহার পর যখন খেলা হবে তখন আমি বলরামের পক্ষে খেলিব। যদি খেলায় জিতি তবে কানাইর কাঁধে চড়িব, আর যদি হারি তবে না হয় কানাইকে কাঁধে লইব, সে ত সুখেরই কথা। বলাইর পক্ষে থাকিলে আর বলাইকে কাঁধে করিতে হইবে না। বাপ্‌রে ! মত্ত বলরামকে বিপক্ষে দেখিলেই যে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়। তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিতে পারে কাহার সাধ্য !

"আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যাই ॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিকে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।

খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সবারে মারে
ঘনরাম দাস দেখি কয়॥"

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে চাঁদের হাট মিলাইয়া যমুনাতীরে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। খেলাভঙ্গ হইলে চাঁদমুখ শিশুগুলি স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। কেহ বা বেণু কেহ বা শিঙ্গা বাজাইতেছে, কেহ কেহ ভ্রমরগুঞ্জনের সহিত গলা মিশাইয়া গান গাহিতেছে, কেহ কেহ কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে কুহু কুহু করিতেছে, কেহ কেহ হংসগণের সহিত তাহাদেরই মত হইয়া চলিতেছে, কেহ কেহ বা ময়ূরদিগের সহিত ঠাঁট করিয়া নাচিতেছে, কেহ কেহ গাছে চড়িতেছে, কেহ কেহ হরিণ শাবকের গলা জড়াইয়া এক সঙ্গে চলিতেছে, আবার কেহ কেহ পর্ব্বত-প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণাগুলি লম্ফ দিয়া পার হইতেছে, কেহ কেহ বা জলাশয়ে আপনাদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তৎপ্রতি মুখভঙ্গী করিতেছে, এবং কেহ কেহ স্ব স্ব প্রতিধ্বনি শুনিয়া আক্রোশের সহিত কত রকম শব্দ করিতেছে। এইরূপভাবে সারাদিন তাহাদের লীলা খেলা চলিল।

খেলা সাঙ্গ হইলে সঙ্গে আনীত খাদ্য দ্রব্য বাঁটিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া ভোজন করিল। গৃহে ফিরিবার সময় বুঝিয়া

কৃষ্ণ বেণুরব করিলেন এবং বলরাম শিঙ্গায় ফুঁ দিলেন। অমনি বৎসসকল পুচ্ছ উচ্চ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে গৃহপানে ছুটিল, তাহাদের ক্ষুরোত্থিত ধূলারাশিতে পথ ঘাট আচ্ছন্ন হইল। ব্রজরাখালের দল কৃষ্ণবলরামকে মাঝে করিয়া শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অঘাসুর বধ

কৃষ্ণ প্রতিদিনই বৎসচারণ করিতে বাহির হন এবং ব্রজ-বালকদিগকে লইয়া নিত্য নূতন খেলা পাতিয়া তাহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করেন। এইরূপে একদা তিনি সখাগণসঙ্গে বৎসচারণ করিতে করিতে যমুনাপুলিনে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৎস-কুল প্রান্তরে ছাড়িয়া দিয়া সকলের সঙ্গে খেলায় উন্মত্ত হইলেন। আজ কি কারণে বলরাম বৎসচারণে আসিতে পারেন নাই।

শিশুগণ খেলায় মত্ত। এই সময়ে কংস-প্রেরিত অঘ নামক অসুর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণনাশের নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকেরা যে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে বিচরণ করিতেছে তাহা দেখিয়া হিংসুক অঘাসুরের প্রাণে যেন শেল বিঁধিতে লাগিল। “কত ক্ষণে উহাদিগকে গ্রাস করিব” এই চিন্তায় অসহিষ্ণু হইয়া সে সেখানে আসিল এবং যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ ও পর্ব্বততুল্য বিশাল অজগরদেহ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণকে ও তাঁহার সহচর বালকগণকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ বিস্তার

করিয়া পথের মধ্যে পড়িয়া রহিল। বালকগণ দূর হইতে উহাকে দেখিয়া সর্প বলিয়া বুঝিতে পারিল না।

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ ভাই, সম্মুখে কেমন একটা পাহাড় দেখা যাইতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একটা প্রকাণ্ড অজগর শুইয়া রহিয়াছে। চাহিয়া দেখ, ঐ পর্ব্বতের কত বড় একটা গহ্বর, আর কেমন দুইটা রাস্তা ঐ গহ্বরের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে! গহ্বরটা যেন অজগরের বিস্তৃত মুখ আর রাস্তা দুইটা যেন উহার দুইটা জিহ্বা! সত্য সত্যই বোধ হইতেছে যেন একটা বিশাল অজগর আমাদের সকলকে গ্রাস করিবার জন্য হা করিয়া আছে। চল, সকলে উহার মুখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ওটা কি করে। কৃষ্ণ সঙ্গে থাকিতে আমাদের ভয় কি? অজগর যদি নিতান্তই আমাদিগকে গ্রাস করে তবে কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমধ্যেই উহাকে বকাসুরের দশা করিয়া দিবে, চিন্তা কি?"

এইরূপে ব্রজবালকগণ প্রকৃত অজগরকে কল্পিত অজগর ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে বৎসগণ লইয়া তাহার মুখের ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু মনে ভাবিল যে পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া শুনিয়াও কাহাকে নিষেধ করিলেন না, নিজে সকলের পশ্চাৎ রহিলেন। বালকেরা মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অজগর তাহাদিগকে গ্রাস করিল না। কারণ তখনও কৃষ্ণ বাহিরে ছিলেন, কৃষ্ণের প্রাণ সংহার করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্ব

শেষে কৃষ্ণ যেমন উহার মুখের ভিতরে গিয়াছেন অমনি সেই ভীষণ অসুর সকলকে গিলিতে উদ্যম করিল। কিন্তু এ কি রকম হইল! বেচারি যে আর দুই ওষ্ঠ একত্র করিতে পারে না! শ্রীকৃষ্ণ বালক ও বৎসগণসহিত আপনাকে উহার গলার ভিতরে ক্রমাগত বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে অঘাসুরের গলার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটা বাহির হইয়া পড়িল। সে ফাঁফর হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া ঘুরিতে ফিরিতে ও শরীর মোড়ামুড়ি দিতে লাগিল। শ্বাস বন্ধ হইলে আর প্রাণ কতক্ষণ থাকে? ক্ষণকালমধ্যেই অজগরের দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, গোপবালক ও বৎসগণ সকলেই মূর্চ্ছিত। তিনি স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সকলকে সচেতন করিয়া বৎস ও রাখালগণসহ বাহিরে আসিলেন। স্বর্গ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল এবং অপ্সরা গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরসকল নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

পুলিনভোজন ও ব্রহ্মসংমোহন

অঘাসুরের গ্রাস হইতে রাখালগণকে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভাই, বেলা অধিক হইয়াছে, আমরা সকলেই বিশেষ ক্ষুধার্ত্ত, এখন এস, এই মনোরম যমুনাপুলিনে বসিয়া ভোজন করি।" বালকেরা বৎসকুলকে জল পান করাইয়া তৃণক্ষেত্রে

ছাড়িয়া দিল এবং কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বসিয়া মনের আনন্দে ভোজন করিতে লাগিল।

তাহাদের ভোজন-পাত্র হইল গাছের পাতা, আর জল-পাত্র হইল শিঙ্গা! খাইতে খাইতে যাহার যাহা ভাল লাগিতেছে সে তাহাই ভাই কানাইর মুখে তুলিয়া দিতেছে। কানাইকে খাওয়াইয়া তাহাদের কত সুখ!

"সখাগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভোজনসম্ভার ছিল ভারে ভার
ভোজনে বসিলা রঙ্গে॥
যমুনাপুলিনে বেড়ি সখাগণে
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বন পাত তাহে নিল ভাত
জল ভরি শিঙ্গা বেণু॥
সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈয়া
সবে দেই কানুর মুখে॥"

বালকগণ এইরূপে কৃষ্ণকে মাঝে বসাইয়া কৌতুক পরিহাস করিতে করিতে বিবিধ রসাল খাদ্যদ্রব্যে রসনার তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল। এদিকে বৎসসকল তৃণের লোভে চরিতে চরিতে কোন্ দূর বনে গিয়া প্রবেশ করিল। রাখালেরা চাহিয়া দেখে যে, প্রান্তরে একটি বৎসও নাই। অমনি সকলে আহার ফেলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল।

তাহাদের ব্যস্ততা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা আহার না করিয়া কেহ উঠিও না, তোমাদের কোনও ভয় নাই, আমি এক্ষণেই তোমাদের সকল বাছুর আনিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়াই কৃষ্ণ অমনি বৎসগণের অন্বেষণে বাহির হইলেন, তিনি মুখে দিবেন বলিয়া যে গ্রাস হাতে তুলিয়াছিলেন তাহা হাতে করিয়াই ছুটিলেন।

কৃষ্ণ বহু স্থানে বৎসগণের অন্বেষণ করিলেন কিন্তু উহাদিগকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া যমুনাপুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, বৎসপালগণও (রাখালগণ) সেখানে নাই ! কৃষ্ণ পুনরায় বৎস ও বৎসপালগণকে খুঁজিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা স্বধামে থাকিয়াই অঘাসুর-নিধন দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীভগবান নন্দনন্দনের অপর লীলামহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত বৎস ও ব্রজবালকদিগকে স্বীয় মায়াদ্বারা মোহিত করিয়া অপহরণপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ সকলই জানিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করিবার জন্য যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই এইরূপভাবে বৎসকুল ও বালকদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

বেলা অবসানপ্রায়, এখন গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিবার সময়। কিন্তু কৃষ্ণ একাকী কেমন করিয়া ব্রজে ফিরিবেন ? ব্রজের জননীগণ যখন আসিয়া আপনাপন সন্তানের সংবাদ

জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তিনি কি উত্তর করিবেন ? কি কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন ? এ সকল ভাবিবার কথা বটে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছামাত্র কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন, নিজেই বহু হইতে পারেন, এক সময়ে বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন।

ব্রহ্মাকে মোহিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৎসপাল ও বৎস হইলেন। তাঁহার ইচ্ছামাত্র যমুনাপুলিনে আবার চাঁদের হাট মিলিল। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, মধুমঙ্গল, সুবল প্রভৃতি গোপবালকেরা শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য সাজিয়া দাঁড়াইল। বৎসকুল পুচ্ছ উচ্চ করিয়া উল্লম্ফন করিতে করিতে আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ নিজেই সকল হইলেন। যাহার যেমন আকৃতি, যাহার যেমন বয়স, যেমন শিঙ্গা, বেণু ও বসনভূষণ, যেমন যেমন বৎসগণ, তৎসকলই শ্রীকৃষ্ণ নিজে হইলেন। তিনি আপনাকে অগণিত বৎসরূপে পরিণত করিয়া নিজেই বহু রাখালরূপে উহাদিগকে চালনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন।

ব্রজবালকগণের জননীগণ বেণুরব শ্রবণে সত্বর হইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বালকের রূপধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র মনে করিয়া স্নেহভরে বুকে ধরিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন, পরে তাহাদের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া মুছিয়া গোষ্ঠের বেশ বদলাইয়া দিলেন এবং স্ব স্ব বালকের রুচি-অনুযায়ী আহার্য্যদ্বারা তাহাদিগকে আহার করাইতে লাগিলেন।

সকল গোশালায় হাম্বা হাম্বা রব পড়িয়া গেল। গাভীসকল প্রান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নেহে আপনাপন বাছুরের গা চাটিতে লাগিল, বৎসগণ সারাদিনের পর আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া জননীর স্তনপানে রত হইল।

গোপীগণ আপনাপন পুত্রাপেক্ষা যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাধিক স্নেহ করিতেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু এক্ষণে নিজ নিজ পুত্রের প্রতি তদপেক্ষা অধিক স্নেহাকর্ষণ দৃষ্ট হইল, এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত উহা এমত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহার সীমা রহিল না। বৎসসকলের প্রতিও গাভীগণের স্নেহ মমতা পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৎস ও বৎসপালক হইয়া সম্বৎসর পর্য্যন্ত বনে বনে ও গোষ্ঠে গোষ্ঠে ক্রীড়া করিলেন। এতদিন বলদেবও মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচ সাত দিবস অবশিষ্ট থাকিতে বলরাম একদিন বৎসচারণ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বন হইতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কিছু দূরে অবস্থিত। সেই সময়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশে কতগুলি গাভী চরিতেছিল, তাহারা নিম্নে ব্রজসমীপে আপনাপন বৎসসকল দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র গাভীগণ অত্যন্ত স্নেহাকৃষ্ট হইল এবং চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ প্রবল আকর্ষণে ছুটিয়া চলিল। তাহারা দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া

পৃষ্ঠে লাঙ্গুল তুলিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল, গোপগণ কিছুতেই উহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে গাভীসকল সমতল প্রান্তরে আসিয়া বৎসগণের সহিত মিলিত হইল এবং অত্যন্ত স্নেহের আবেগে এরূপভাবে উহাদের গাত্রলেহন করিতে লাগিল যেন উহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে! গোপগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং তথায় স্ব স্ব পুত্রগণকে দেখিয়া স্নেহে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহারা আপনাপন পুত্রকে গ্রহণ করিয়া বারংবার বাহুদ্বারা আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিল। কেহই তনয়কে বুকে ধরিয়া আর ছাড়িতে পারে না, যেন উহাদের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইতে চায়!

এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া বলদেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এক বৎসর পরে তাঁহার মোহ ভাঙ্গিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের যেরূপ অত্যধিক প্রীতি ছিল, এক্ষণে আপনাদের বালকের প্রতি তদ্রূপ গাঢ় স্নেহ দেখিতেছি। ব্রজবালকদিগের প্রতি আমারও প্রীতি উত্তরোত্তর সাতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে, এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! বৎসগণের প্রতি গাভীদেরও তদ্রূপ বৃদ্ধিশীল স্নেহ দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ কি? এ কোন্ মায়া? যখন ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে তখন মনে হয় যে ইহা কৃষ্ণেরই মায়া।"

বলরাম এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানময় নেত্রে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সকল বৎস, সমুদায় সখা, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ। তখন

তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, আমি আগে জানিতাম যে, এই সকল ব্রজবালক দেবগণের অংশ এবং এই সকল বৎস ঋষিদিগের অংশ, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমিই সকল, তুমিই সর্ব্বরূপে দীপ্তি পাইতেছ! এ সকল কি? কেমন করিয়া এরূপ হইল?" তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস ও বৎসপাল হরণের আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বলরামকে বলিলেন।

ব্রহ্মা যে দিন বৎস ও বৎসপালকদিগকে হরণ করিয়া নিয়াছিলেন সেই দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু আমাদের এক বৎসর, ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্তকাল মাত্র। ব্রহ্মা বৎস ও শিশুরাখালের দলকে স্বধামে রাখিয়া মুহূর্ত্তপরেই যমুনাতীরে চলিয়া আসিলেন। মনোগত ভাব এই যে, "দেখি গিয়া, কৃষ্ণ কি করিতেছেন।"

ব্রহ্মা চাহিয়া দেখেন যে, কালিন্দীর উপকূলে ব্রজবালকগণ ঠিক তেমনি তেমনি রহিয়াছে, বৎসকুলও ঠিক তেমনি তেমনি বিচরণ করিতেছে। যাহার যেমন বয়স, আকৃতি, বর্ণ, গঠন, চালচলন ও বসনভূষণাদি, সকলই ঠিক তেমন তেমনই দৃষ্ট হইল। দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, "এ কি! গোকুলে যত বালক ও গোবৎস ছিল, সকলকেই আমি আমার মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ইহারা কোথা হইতে আসিল?" ব্রহ্মা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না যে, এ সকলই ঠিক, কি যাহাদিগকে তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছেন সে সবই ঠিক! কৃষ্ণকে মোহিত করিতে গিয়া তিনি নিজেই

মোহগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় স্তব্ধ ও বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তখন ব্রহ্মা বৎসপাল ও বৎসসকল আর দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন সকলই শ্রীকৃষ্ণ। সকলেরই নবঘনশ্যাম বর্ণ, সকলেই পীতবসনধারী, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এবং কিরীট কুণ্ডল হার ও বনমালায় অলঙ্কৃত, সকলেরই চরণে ভক্তজনগণকর্ত্তৃক অর্পিত কোমল তুলসীর দাম শোভা পাইতেছে। দেখিয়া ব্রহ্মা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মায়া-যবনিকা অপসৃত করিলেন। ব্রহ্মা যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, অদূরে বৃন্দাবন দৃষ্ট হইতেছে, আর তিনি যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ ভোজনগ্রাস হাতে লইয়া বৎস ও বৎসপাল খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রহ্মার মোহ কাটিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন এবং আপনার চারি মস্তকে কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তকস্থিত কিরীটচতুষ্টয় পুনঃ পুনঃ ভূমিস্পর্শ হেতু ঝনৎঝনৎ শব্দে বাজিতে লাগিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণে বারংবার প্রণত হইয়া ব্রহ্মা কম্পিতকলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অশেষবিধ স্তবস্তুতি করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে বৎস ও বালকগণ তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আনীত ও যথাভাবে স্থাপিত হইল। যমুনাপুলিনে আবার সেই

দৃশ্য ! বালকগণ ভোজন করিতে করিতে ভোজনে বিরত হইয়া কৃষ্ণের আগমন-পথ চাহিয়া আছে, আর দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ বৎসসকল লইয়া আসিয়া উপস্থিত। এ দিকে যে এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, বালকদের কাহারও সে জ্ঞান নাই। তাহারা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই, তুমি এত শীঘ্র কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিলে! আমরা তোমাকে রাখিয়া একটিমাত্রও গ্রাস ভোজন করি নাই, এস ভাই, এখন বসিয়া নিশ্চিন্তে আহার কর।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বসিয়া তাহাদের সঙ্গে ভোজন করিলেন এবং ভোজনান্তে বৎস ও বালকের দল লইয়া শিঙ্গাবেণুর রবে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে মৃত অঘাসুরের শুষ্ক চর্ম্ম সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গোপবালকগণ গৃহে আসিয়া বলিতে লাগিল, "কৃষ্ণ অদ্য একটি প্রকাণ্ড সর্প বিনাশ করিয়া আমাদিগকে উহার করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

গোচারণ

এতদিন শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৎসচারণই করিতেছিলেন। এখন তাঁহাকে গোচারণের বয়সে উপনীত দেখিয়া পিতামাতার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা কৃষ্ণকে গোচারণে অনুমতি দিলেন। এখন হইতে কৃষ্ণ প্রতিদিন ধবলী, শ্যামলী, পিঙলী প্রভৃতি গাভীগণ লইয়া দাদা বলরাম ও সুবলাদি

সখাবৃন্দসঙ্গে বৃন্দাবনের বনে বনে স্বচ্ছন্দে ধেনু চরাইতে লাগিলেন। বৃন্দাবন বিবিধ কুসুমাকর বন-উপবন, গিরি-প্রান্তর নদীসরোবর প্রভৃতির শোভাসম্পদে অতুলনীয় স্থান। বৃন্দাবনের বনভূমি সতত সুমধুর শব্দকারী ভ্রমর, মৃগ ও বিহগসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তথায় স্বচ্ছসলিল সরোবরসকলে প্রস্ফুটিত শতদলের পরিমল বহনপূর্ব্বক সুশীতল সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে। শাখায় শাখায় কোকিল-কূজন, পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরগুঞ্জন, যথায় তথায় শিখিগণের নৃত্য ও মৃগশাবকগণের উল্লম্ফন ও সানন্দ গতিবিধি, ঝোঁপে ঝোঁপে মনোমদ কেতকী মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমনিচয়ের সুমধুর হাস্য-বিকাশ, মলয়মারুতসেবিত ললিতলবঙ্গলতার মৃদু আন্দোলন প্রভৃতির একত্র সমাবেশে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি চিরমাধুর্য্যে নিমজ্জিত।

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে আসিয়া এই মধুময় বৃন্দাবনের বনে বনে যে কত বিচিত্র মধুর লীলা করিতেন তাহা বর্ণনা করিতে পারে এমন কে আছে ? তিনি ধেনুগণ প্রান্তরে ছাড়িয়া দিয়া পরম কুতূহলে সখাগণসঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, আবার সময় সময় ক্রীড়া করিতে করিতে অকস্মাৎ, কি জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া একাকী কোথায় কোন্ দূর বনে চলিয়া যাইতেন। এক-মাত্র সুবল ভিন্ন তাঁহার মনের সকল কথা—সকল রহস্য অন্য কেহ জানিত না।

এক দিন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে একাকী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ

করিয়া আর শীঘ্র ফিরিতেছেন না দেখিয়া বালকগণ সাতিশয় চঞ্চল হইল। বলরাম কৃষ্ণের অনুসন্ধানের নিমিত্ত সুবলকে পাঠাইলেন। যে যে স্থানে গেলে কৃষ্ণের দেখা পাইবার সম্ভাবনা, সুবল সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার দেখা পাইলেন না। তখন যত রাখালবালক মিলিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোথা গেলি ভাই" এইরূপ বলিতে বলিতে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই বনের গভীরতর প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে তাহাদের চক্ষু স্থির হইল। দেখিল, বনভূমি কি এক দিব্যালোকে দীপ্তি পাইতেছে, তাহার মধ্যে উজ্জ্বল কনকপ্রভাসমন্বিতা দশ-ভুজা এক রমণী কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। হংস-বাহন চতুর্ম্মুখ এক দিব্যপুরুষ আসিয়া কৃষ্ণের চরণ পূজা করিয়া গেলেন। তারপর বৃষপৃষ্ঠে চড়িয়া পঞ্চমুখ আর এক জন আসিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা, তিনি সর্ব্বদাই ববম্ ববম্ করিয়া গালবাদ্য করিতেছেন, তাঁহার দুটি নয়ন যেন নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু করিতেছে, ললাট হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। তিনি কৃষ্ণসমীপে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। আর একজন দিব্যদেহ-ধারী গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়িয়া আসিলেন, আসিয়া সচন্দন তুলসী-দলে কৃষ্ণের যুগলচরণ পূজা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দিব্য তেজঃপুঞ্জ এক বৃদ্ধ ঋষি আসিয়া বীণাযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন!

এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া রাখালবালকেরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহাদিগের পানে কৃষ্ণের চক্ষু পড়িল। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই দেবী দশভুজার কোল ছাড়িয়া সখাগণসমীপে আগমন করিলেন, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ও বৃদ্ধ ঋষিও সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

কৃষ্ণ আসিয়াই বালকদিগের সহিত এমন চতুরতার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, বালকেরা কোনও প্রশ্ন করিবার অবকাশ পাইল না। তিনি সকলকে নানা কথায় ভুলাইয়া পুনরায় তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ব্রজে ফিরিবার সময় হইল। তখন ধেনু বৎসগণের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু তাহারা যে কোন্ অজানিত বনে গিয়া বিচরণ করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি বালকেরা ধেনু না দেখিয়া বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভাই, তা' হবে না, খেলা ভাঙ্গা হবে না, আমি বেণু বাজাইয়া একটী একটী করিয়া সকল ধেনু আনিয়া দিতেছি, তোমরা চঞ্চল হইও না।"

"ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলাভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু-রবে॥"

(প্রেমদাস)

সত্য সত্যই কৃষ্ণের মুরলীরবে সমস্ত ধেনুবৎস পৃষ্ঠের উপরে পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে আসিতে লাগিল।

"সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চৈস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনুবৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন॥"

কালিয় দমন

এইরূপে গোচারণ করিতে করিতে একদিন নিদাঘ কালে শ্রীকৃষ্ণ বলরামভিন্ন অপরাপর গোপবালকদিগের সহিত যমুনা-তীরে গমন করিলেন। বালকগণ সাতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যমুনার জল পান করিবামাত্র সকলে তথায় অচেতন হইয়া পড়িল। ধেনুবৎসগণেরও সেই দশাই ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আপনার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সংজীবিত করিলেন। যে স্থানে রাখালেরা জলপান করিয়াছিল, যমুনার সেই অংশ একটা দহ অর্থাৎ হ্রদের মত হইয়াছিল। ঐ হ্রদে কালিয় নামক মহাবিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহাদিগের

তীব্র বিষে ঐ হ্রদের জল মহাবিষাক্ত হইয়াছিল, তাই বালকেরা ঐ জল পান করিবামাত্র অচেতন হইয়া পড়ে। কেবল হ্রদের জল নহে উহার উপরিভাগস্থ বায়ুমণ্ডলও সর্পবিষে দূষিত হইয়াছিল।

"কালিন্দীর এক দহে কালীনাগ তাহা রহে
বিষ-জল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে ত্যজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যদি যায় কূলে
জলের বাতাস পাইয়া মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরিয়াছে কত
বিষজ্বালা সহিতে না পারে॥"

(মাধব দাস)

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকর্ত্তৃক যমুনার জল দূষিত অবলোকন করিয়া উহার প্রতিকারে কৃতসংকল্প হইলেন। কৃষ্ণের একটি স্বভাব এই যে, দুষ্টের দমন না করিয়া তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি কালিয়নাগের শাসন করিতে মনস্থ করিয়া তীরস্থিত একটি কদম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। ঐ বৃক্ষটি কোন বিশেষ কারণে জীবিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়রূপে কটির বসন আঁটিয়া বাঁধিয়া বৃক্ষের উপর হইতে কালীদহের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পতনশব্দ শুনিয়া ও সমস্ত হ্রদের জল আলোড়িত

হইতে দেখিয়া কালিয়নাগ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে সহাস্য-বদনে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কালিয়ের ক্রোধের অবধি রহিল না। দেখিতে দেখিতে ঐ মহাবল দুষ্ট সর্প মহারোষে শ্রীকৃষ্ণের সুকুমার অঙ্গে দংশন করিতে করিতে তাঁহাকে শরীর দ্বারা বেষ্টন করিল। ইহা দেখিয়া বালকগণ তীরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ধেনুবৎসগণও চক্ষের জলে ভাসিয়া আকুল হাম্বারবে গগন বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল।

"দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুলমন
পড়ে সবে মূরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সবে পাইয়া॥
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এসব বাণী পাষাণ হইলা পাণী
মাধব অবনী গড়ি যায়॥"

(মাধব দাস)

এ দিকে ব্রজে বিবিধ দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিবা দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ বৃন্দাবন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ঘন ঘন ভূমিকম্প ও বিন্দু বিন্দু রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল।

ব্রজবাসিগণের চক্ষে কেমন এক ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল যে, তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই কেবল সর্প দেখিতে লাগিলেন।

"দিবসে আঁধার গোকুলনগর
সঘনে কাঁপয়ে মহী।
রুধির বরিখে নয়ান নিমিখে
সবাই হেরয়ে অহি॥"

(মাধব দাস)

"শ্রীকৃষ্ণ আজ বলরামকে না লইয়া গোচারণে গিয়াছেন, না জানি তাঁহার কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে" এরূপ চিন্তা করিয়া নন্দ, যশোদা ও ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা আকুল হইলেন।

"নন্দ যশোমতী গোপ গোপী তথি
বিচার করয়ে মনে।
বলরাম বিনে সখাগণসনে
কানাই গিয়াছে বনে॥
যশোমতী কহে দারুণ স্বপন
দেখিনু রজনীশেষে।
আমার গোপালে ভুজঙ্গে বেড়ল
জারল বিষম বিষে॥"

(মাধব দাস)

আর যে বিলম্ব সহে না। মা যশোদা পাগলিনীর ন্যায় ঘরের বাহির হইয়া গোচারণের মাঠের দিকে ছুটিলেন। কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজাঙ্গনাগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

"ব্রজবাসী কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা
শুনিয়া চলিলা ধাই।
যাহা শিশুগণ করয়ে রোদন
তাহাই মিলিলা যাই॥"

(মাধব দাস)

তাঁহারা যমুনার তীরে যাইয়া শুনিলেন যে, কৃষ্ণ কি জানি কি ভাবিয়া কদম্ববৃক্ষের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িয়াছেন, আর তৎক্ষণাৎ কালিয়নাগ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক নিষ্পেষণ করিতেছে! তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই কৃষ্ণ নাগপাশে আবদ্ধ। তখন সকলের যে কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য।

"কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চ স্বর করি
কোথারে গোকুলচন্দ্র।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজগে হইলা বন্ধ॥
শিরে কর হানে বিষজল পানে
সঘনে ধাইয়া যায়।
দু বাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায়॥"

(মাধব দাস)

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কৃষ্ণ এক্ষণেই দুষ্টের দমন করিয়া উঠিবেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি অস্থির না হইয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে

লাগিলেন। কেবল যশোদা নহেন, ব্রজের সকল গোপগোপীই কৃষ্ণশোকে অধীর হইয়া কালিন্দীর বিষ-জল পান করিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন, আর বলরাম একে একে সকলকে ধরিয়া রাখিতেছেন।

"ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণীদেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সবায়॥
নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সবে প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিবে কালী-দমন করিয়া॥"

(অজ্ঞাত)

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা ও গোপগোপীগণকে শোকাতুর ও মুমূর্ষুপ্রায় অবলোকন করিয়া কালিয়নাগের বেষ্টন হইতে আপনাকে নিঃসরণ করিবার জন্য নিজ দেহ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের পরিবর্দ্ধনে ব্যথিতকলেবর হইয়া কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিল এবং ক্রোধে ফণাসকল উন্নত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সেই সময়ে উহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছিল। কালিয় বারংবার নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিতে যায় আর

শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে তাহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। তাহাতে কালিয় কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানসকলে দংশন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল, কৃষ্ণও চতুরতার সহিত আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া কালিয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজদ্বারা তাহাকে অবনত করিয়া তাহার মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয় শত ফণা বিস্তার করিয়া মহারোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ফণায় ফণায় বিচরণপূর্ব্বক তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহাতে কালিয়ের মাথার মণিসকল খসিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ ও নাসিকাবিবর হইতে ক্রমাগত রুধির বমন হওয়াতে সে একেবারে নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল, আর মাথা তুলিতে পারে না, প্রাণ যায় যায়।

"ফণায় ফণায় দমন করি।
নটবরভঙ্গে নাচয়ে হরি॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগারে অনল সমান বিষ॥
ফণিমণিগণ পড়য়ে খসি।
পূজয়ে চরণ-নখর-শশী॥" (মাধব দাস)

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কালিয় শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইল। নাগপত্নীগণ আসিয়া কাতরকণ্ঠে করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের বহু স্তবস্তুতি পূর্ব্বক স্বামীর অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল।

"নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজমণি হরষিত অতি॥
ফণি-পতি অতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণনীত।" (মাধব দাস)

নাগপত্নীগণের করুণক্রন্দনে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল। তাঁহারা স্বামীর প্রাণভিক্ষা করিতেছিলেন, আর এদিকে দুষ্ট কালিয়নাগও অবনতমস্তকে কৃষ্ণচরণে শরণ লইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কাহারও কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং শরণাগতজনকে কখনও পরিত্যাগ করেন না। তিনি কালিয়কে অভয়প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তুমি আর এস্থানে থাকিতে পারিবে না, এক্ষণেই এই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর।" কালিয় তাহাই করিল।

শ্রীকৃষ্ণ আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তীরে উঠিলেন। মা যশোদা দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহার অঞ্চলের নিধি নয়নমণি নীলমণিকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন, জননীর স্তনক্ষীরে আখিনীরে কৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সকল ব্রজবাসী ও ব্রজাঙ্গনাগণের মৃতদেহে জীবন ফিরিয়া আসিল। পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

"ফণিপতিবরে অভয় করি।
জল সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ লোরে॥"

নানা কথা

কালিয়দমনের পর হইতে ব্রজবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত বালক হইলেও তাঁহার বলবীর্য্য অসাধারণ এবং তিনি সকল আপদ বিপদ হইতে আপনাকে ও সমস্ত গোকুল অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন এমন শক্তি তাঁহাতে আছে। বলরামের শক্তি সামর্থ্যের উপরও তাঁহাদের বিশ্বাস পূর্ব্বহইতেই ছিল।

যে দিবস কৃষ্ণ কালিয়-দমন করেন সেই দিন অতিশয় ক্লান্তিবশতঃ গোপগোপীগণ কৃষ্ণবলরামকে লইয়া যমুনাতীরেই রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সকলে অঘোর নিদ্রায় অচেতন, অকস্মাৎ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। সকলে জাগরিত হইয়া এই আসন্ন বিপদে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তমধ্যে সেই দাবানল প্রশমিত করিয়া সকলকে নিরাপদ করিলেন।

আর এক সময় রাখালগণ গোচারণে যাইয়া ধেনুবৎসসহিত দাবানলের মধ্যে পড়িয়াছিল। সে যাত্রায়ও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা না করিলে সকলেই মুহূর্ত্তমধ্যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইত। ইহার পরে বিভিন্ন সময়ে বলরামও প্রলম্ব ও ধেনুক নামক দুই মহাবল অসুরকে নিহত করিয়া অসাধারণ বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধন ধারণ

শ্রীকৃষ্ণের বয়স এখন সাত বৎসর। এই সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে পিতা নন্দ ও অপরাপর গোপগণ মিলিয়া

মহাসমারোহে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় অসীম প্রভাববশতঃ মনে মনে একটু গর্ব্বিত ছিলেন। দর্প-হারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার উপায় স্থির করিয়া পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাদিগের এ কি উৎসব উপস্থিত হইল? ইহার কি ফল? কোন্ দেবতার উদ্দেশে এইরূপ বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন হইতেছে? কৃপা করিয়া আমাকে সমস্ত বলুন।" গোপরাজ বলিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণের অধিপতি। মেঘসকল তাঁহারই প্রিয় মূর্ত্তি। ঐ মেঘ সকল বারিবর্ষণ না করিলে জীবকুল জীবিত থাকিতে পারে না। এই কারণে দেবাধিপতি ইন্দ্রের পূজা করা আবশ্যক। আমরা ইন্দ্রযাগার্থ এই সকল আয়োজন করিতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি ইন্দ্রের পূজা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না। এই যে গিরি-গোবর্দ্ধন দেখিতেছেন ইনি প্রত্যক্ষ দেবতা এবং গোকুলের রক্ষাকর্ত্তা। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আপনারা ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তৎসমুদায় লইয়া গিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করুন। দেখিবেন, গিরিবর নিজমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া আপনা-দিগের পূজোপহার গ্রহণ করিবেন।"

এক দিন ব্রজে ইন্দ্র পূজা কাজে
সাজে গোপগোপী যত।
জানিয়া কারণ নন্দের নন্দন
কহেন আপন মত॥

"শুন ব্রজরাজ গোপের সমাজ
না পূজ দেবের রাজা।
মোর লয় মনে গিরি-গোবর্দ্ধনে
সাবধানে কর পূজা॥"

(কৃষ্ণদাস)

শ্রীকৃষ্ণের কথায় নন্দমহারাজ ও গোপগোপীগণ সকলেই ইন্দ্রপূজার জন্য আনীত সমস্ত উপকরণদ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করা উচিত বোধ হইতেছে না, আসুন এইক্ষণেই যাত্রা করা যাউক।" অতঃপর গোকুলের গোপসমাজ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া মঙ্গলগান করিতে করিতে গোবর্দ্ধন যাত্রা করিলেন।

"নন্দ আদি গোপগোপী একত্র হইয়া।
গিরি-গোবর্দ্ধন পূজে নিকটে যাইয়া॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি ধরিলা সকলে।
কৃষ্ণগুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে॥"

(কৃষ্ণদাস)

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা। তিনি ইচ্ছামাত্রে এক হইয়াও বহু হইতে পারেন। ব্রহ্মাকে মোহিত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং বৎস ও বৎসপাল হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এক্ষেত্রেও তিনি সেইরূপই করিলেন। তিনি কোনও বিশেষ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের উপরে বিরাজ

করিতে লাগিলেন, এ দিকে নন্দনন্দনরূপে গোপগোপীগণের নিকট রহিলেন।

"তেনই সময়ে কৃষ্ণ দেবমায়া মতে।
আরোহণ এক রূপে করিলা পর্ব্বতে॥
দেখি গোপগোপীগণ প্রণাম করিলা।
সবে কহে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমন্ত হৈলা॥"

কেবল তাহাই নহে। গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমান হইয়া সকলকে দর্শন দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, নিকটে আসিয়া নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদিও আহার করিলেন।

"মূর্ত্তিমন্ত গোবর্দ্ধন আপনে আইলা।
অন্ন ব্যঞ্জন সব ভোজন করিলা॥
কৃষ্ণ কহে এই শৈল কর নমস্কার।
মাগি বর লেহ সবে যে ইচ্ছা যাহার॥"

(অজ্ঞাত)

গোপগোপীগণ সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন। অমনি সকলে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণও সেই মূর্ত্তিমান্ দেবতাকে প্রণাম করিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখ, আমাদিগের কি সৌভাগ্য, স্বয়ং গোবর্দ্ধন আজি কৃপা করিয়া আমাদিগের নয়নগোচর হইলেন, এবং এই সকল অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেন। আপনারা দেখুন, আমার কথা সত্য হইল কি না। ইনিই গোকুলের রক্ষাকর্ত্তা, ইনিই আমাদিগের সকল অভীষ্ট প্রদান করিবেন।"

"যত ব্রজবাসী সবে পাইয়া আহ্লাদ।
পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ॥
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে সাজায়ে গোধনে।
বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥"

(কৃষ্ণদাস)

ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের পূজা না করিয়া গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা করাতে দেবরাজ আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ব্রজ ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

"যত গোপগণ পূজে গোবর্দ্ধন
না কৈল ইন্দ্রের পূজা।
পাই অপমান কোপে কম্পমান
সাজিলা দেবের রাজা॥
মহা অহঙ্কারে কৃষ্ণ নিন্দা করে
অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া।
কহে গোপপুরী মহাবৃষ্টি করি
আজি ডুবাইব যাইয়া॥"

(চৈতন্যদাস)

দেবরাজ অবিলম্বে তাঁহার আজ্ঞাবহ পবন ও মেঘসকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা যাও, এক্ষণেই যাইয়া গোকুলপুরী ধ্বংস কর।" আজ্ঞামাত্র প্রলয়ের মেঘসকল মহাবেগবান পবন-রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গোকুলের

অভিমুখে ধাবিত হইল। ইন্দ্র স্বয়ং ঐরাবতে চড়িয়া বজ্র-হস্তে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

"ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে
আজ্ঞা দিলা সুরপতি।
শিলাবৃষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজপুরী
যাহ যাহ শীঘ্রগতি॥
আপনি তখনে চড়িয়া বাহনে
বজ্রহস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়া গগন
আইল গোকুলমাঝ॥
চতুর্দ্দিকে মেঘে ধায় বায়ুবেগে
দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে বজ্রের ক্ষেপণে
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার॥"

(চৈতন্যদাস)

গোকুল যায় যায়, আর রক্ষা নাই! এখন কৃষ্ণ ভিন্ন এ বিপদে রক্ষা করে এমন কে আছে? ব্রজ-জন কৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহার শরণ লইবে? ব্রজের যত গোপগোপী অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণের শরণ লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কৃষ্ণ, তোমারই কথায় ভুলিয়া আমরা ইন্দ্রের পূজা না করিয়া এক্ষণে সমূলে নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছি। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পার, এরূপ মনে হইতেছে। তোমার প্রভাব আমরা কালিদহের জলে দেখিয়াছি, আবার

দাবাগ্নিতে পড়িয়াও তোমার বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। আমরা জানি না, বিপদ্‌কালে কোথাহইতে এরূপ শক্তি তোমার ভিতরে আইসে; কিন্তু দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি যে, তোমাতে অলৌকিক শক্তি আছে। অতএব বলিতেছি, কৃষ্ণ! গোকুল গেল, গেল! শীঘ্র রক্ষা কর।"

শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদা, পিতা নন্দ ও অপরাপর গোপ ও গোপাঙ্গনাদিগের কাতরতা দেখিয়া আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না—

"নন্দ আদি গোপগোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিলা কৃষ্ণ ইন্দ্র করে বল॥
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিলা গোবর্দ্ধন॥" (চৈতন্যদাস)

কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে বামকরে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া জনকজননী ও অন্যান্য গোপগোপীগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তোমাদের কোনও ভয় নাই, সকলে আসিয়া এই গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ কর।" তাঁহারা দেখিলেন যে, সত্যসত্যই কৃষ্ণ এক হস্তে গিরিগোবর্দ্ধন তুলিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাদের ভয় দূর হইল না। তাঁহারা বলিলেন, "কৃষ্ণ, একটী কথা শুন। তুমি ত পর্ব্বত মাথার উপর ধরিলে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার হস্ত হইতে যদি গোবর্দ্ধন হঠাৎ পড়িয়া যায়, তবে গোকুলের দশা কি হইবে? অতএব তাহার কি উপায় হইতে পারে তাহা শীঘ্র করিয়া বল।"

বলিহারি কৃষ্ণের মায়াপ্রভাব! ব্রজবাসিগণ এত দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, কৃষ্ণ কে, আর কৃষ্ণ কত শক্তিই বা ধারণ করেন। বাৎসল্যময়ী মা যশোদার ত কথাই নাই। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তোমরা চাহিয়া কি দেখিতেছ? আমার কৃষ্ণ একাকী কেমন করিয়া এই বিশাল পর্ব্বত ধরিয়া রহিবে? ধর, ধর, তোমরা সকলেই ধর। বলাই কোথায়? শ্রীদাম, সুদাম কোথায়? তোরা আয় বাপ্; ধর, তোরা সকলেই ধর।"

"কান্দিয়া যশোদাদেবী কহে গোপগণে।
একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে॥
কোথারে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সবে মেলি গোবৰ্দ্ধন ধর বলরাম॥"

(চৈতন্যদাস)

মাতা বুঝিলেন না যে, কৃষ্ণ একাকীই গোবৰ্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ! যাহাহউক সেই পর্ব্বতগহ্বরে ব্রজের সমস্ত গোপ-গোপী ধেনুবৎসগণ লইয়া সশঙ্কিতচিত্তে এক সপ্তাহকাল কাটাইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সাত দিন ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতে গোকুলের বিশেষ কোনও অনিষ্ট করিতে না পারিয়া কৃষ্ণের নিকটে পরাভব স্বীকার করিলেন।

"তার মধ্যে গোপগণ ধেনু বৎস ধন জন
সশঙ্কিত হইয়া রহিলা।
ইন্দ্রদেব সাত দিন বৃষ্টি করি পরবীণ
পরাভব আপনি মানিলা॥"

(মাধব দাস)

সাত দিন পরে ঝড়, বৃষ্টি, তড়িৎপাত থামিয়া গেল। ব্রজবাসিগণ ধেনুবৎস লইয়া সেই পর্ব্বতগহ্বর হইতে বাহিরে আসিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

"পর্ব্বত-গহ্বরে থাকি ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ এই সবার মন॥
পরাভব মানি ইন্দ্র গেলা নিজস্থান।
ধেনুবৎস লৈয়া উঠে যত গোপগণ॥
নন্দ যশোমতী অতি হরষিত হৈয়া।
বহু দান কৈল কৃষ্ণের কল্যাণ লাগিয়া॥"

(অজ্ঞাত)

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া আপনার সমুজ্জ্বল কিরীটমণ্ডিত মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও বহু স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, "হে প্রভো, তুমি সকলের ঈশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমার প্রভাব কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি মূঢ়, অজ্ঞ। আমি অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে প্রভো, অতঃপর আর যেন আমার এরূপ দুষ্টবুদ্ধি না ঘটে। আমি অভিমান বশতঃ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া বারিবর্ষণ ও বায়ুদ্বারা গোষ্ঠনাশার্থ এই অন্যায় আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার সকল দর্প চূর্ণ হইয়াছে। অতএব হে গোবিন্দ, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে নির্ভয় ও আনন্দিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "দেবরাজ, তুমি ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়াছিলে। অতএব তুমি যাহাতে পুনর্ব্বার আমার স্মৃতি লাভ করিতে পার তজ্জন্য তোমার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়াই আমি যজ্ঞ-ভঙ্গের বিধান করিয়াছিলাম। ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধ ব্যক্তিরা আমাকে দেখিতে পায় না। এজন্য, আমি যাহার মঙ্গল বাঞ্ছা করি তাহাকে সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। দেবরাজ, এক্ষণে স্বর্গে গমন কর। তোমরা গর্ব্ব-রহিত ও স্বীয় কর্ত্তব্যবিষয়ে সাবধান হইয়া নিজ নিজ অধিকারে অবস্থিতি কর, তাহাহইলেই তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আপনার কৃপা লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হই-লাম। আপনার অভিষেকের নিমিত্ত আমি ঐরাবতদ্বারা আকাশ-গঙ্গার জল উদ্ধৃত করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে অনুমতি পাইলে আপনার শ্রীঅঙ্গের অভিষেক করিয়া ধন্য হই।" শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন-বদনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন ইন্দ্র ঐরাবতকরোদ্ধৃত আকাশগঙ্গার জলে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করতঃ তাঁহার "গোবিন্দ" এই নাম প্রচার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ব্রজবাসিগণকে ধারাসম্পাত হইতে রক্ষা করায় স্বর্গের দেবতাগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপ্সরা কিন্নরী

ও বিদ্যাধরীগণ নৃত্যগীতবাদ্যে উল্লাসে মত্ত হইলেন। গোলক হইতে সুরভি স্বীয় সন্ততিগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোবিন্দের নানা স্তব স্তুতি করিয়া বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে জগৎপতে, তুমি আমাদের পরম দেবতা। আমরা পিতামহ ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে তোমাকে অভিষেক করিতে আসিয়াছি, আমাদিগের বাসনা পূর্ণ কর।"

সুরভি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পরম স্নেহে নিজ দুগ্ধ দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিলেন। সেই স্থানে নারদাদি ঋষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সমাগত হইয়া শ্রীহরির যশোগান করিতে লাগিলেন। বৃক্ষসকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল ; বায়ুপ্রবাহ মধুময় হইল। সরিৎসকল ক্ষীরাদি বিবিধ রসে পূর্ণ হইল। পর্ব্বতসকল গর্ভস্থিত মণিরত্নসমূহ বাহির করিয়া শ্রীভগবানের পূজা করিল। ত্রিভুবন আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। এমন কি, ক্রূরস্বভাব সর্পাদি প্রাণিগণও আপনাপন বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের প্রীতিতে পূর্ণ হইল। এইরূপে গো ও গোকুলের পতি শ্রীগোবিন্দের অভিষেক হইলে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

জয় জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজের জীবন প্রাণধন॥
পরিবার সহ ব্রজবাসী।
গর্ত্ত হৈতে উঠিলা হরষি॥

সেই খানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধনগিরি॥
নন্দ আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥
কেহ কেহ করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ॥
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাইয়া।
চাঁদমুখ চুম্বয়ে চাপিয়া॥
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী॥
দেবরাজ পাইয়া পরাভব।
করযোড়ে করে নানা স্তব॥
নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লৈয়া॥
চৈতন্যদাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায়॥